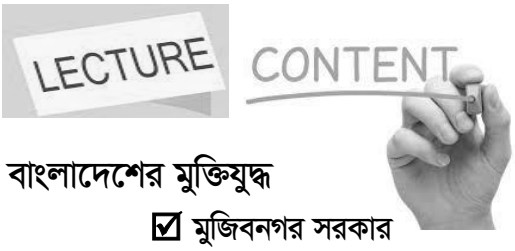

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

- ☑ মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি : ১৯৭১
- ☑ অসহযোগ আন্দোলন
- ☑ ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ
- ☑ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ
- ☑ মুজিবনগর সরকার
- ☑ পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ
- ☑ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারপ্রক্রিয়া
- ☑ মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা

BCS Syllabus

This paper is designed to cover various issues/ topics concerning Bangladesh affairs which include history, geography, envirnment, society, culture, economy and politics.

✪ **The Liberation War and its Background:** Non-cooperation Movement, 1971, Bangabandhu's Historic Speech of 7th March. Formation and Functions of Mujibnagar government, Role of Major Powers and of the UN, Surrender of Pakistani Army, Bangabandhu's return to liberated Bangladesh. Withdrawal of Indian armed forces from Bangladesh.

আলোচ্য বিষয়

▶ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

BCS প্রশ্নাবলী — বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

- ➢ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ৭ই মার্চের ভাষণের প্রভাব বর্ণনা করুন। *(৪০তম বিসিএস)*
- ➢ যুদ্ধাপরাধ বলতে কী বোঝেন? *(৪০তম বিসিএস)*
- ➢ বাংলাদেশে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে আলোচনাপূর্বক যুদ্ধাপরাধের বিচারের তাৎপর্য বর্ণনা করুন। *(৪০তম বিসিএস)*
- ➢ কোথায় এবং কেন মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে? *(৩৮তম বিসিএস)*
- ➢ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তৎকালীন সোভিসেত ইউনিয়ন, চীন ও ভারতের ভূমিকা কি ছিল তা আলোচনা করুন। *(৩৮তম বিসিএস)*
- ➢ আত্মসমর্পণ দলিলের তাৎপর্য কি? *(৩৮তম বিসিএস)*
- ➢ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য কি? *(৩৮তম বিসিএস)*
- ➢ বীরশ্রেষ্ঠগণের নাম লিখুন। *(৩৮তম বিসিএস)*
- ➢ টীকা লিখুন : *(৩৮তম বিসিএস)*
  - (ক) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল
  - (খ) শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস
  - (গ) ১৭ এপ্রিল ১৯৭১

- টীকা লিখুন : মুজিবনগর সরকার *(৩৭তম বিসিএস)*
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রভাব পর্যালোচনা করুন। *(৩৬তম বিসিএস)*
- ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ দলিলের গুরুত্ব বর্ণনা করুন। উক্ত দলিলে পাকিস্তান ও ভারতীয় বাহিনীর পক্ষে কে কে স্বাক্ষর এবং মুক্তি বাহিনীর পক্ষে কে উপস্থিত ছিলেন? *(৩৬তম বিসিএস)*
- আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে এ পর্যন্ত কতজনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়েছে এবং কার কার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। *(৩৬তম বিসিএস)*
- বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, জাতীয় স্মৃতিসৌধ এবং সংসদ ভবনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কি? *(৩৬তম বিসিএস)*
- যুদ্ধাপরাধ কি? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য কয়টি ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছে? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যৌক্তিকতা বর্ণনা করুন। *(৩৩তম বিসিএস)*
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংস্কৃতির অবদান আলোচনা করুন। *(৩৩তম বিসিএস)*
- সংক্ষেপে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি রচনায় ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব কতটুকু? সংক্ষেপে ভাষা আন্দোলনের পটভূমি বাখ্যা করুন। *(২৯তম বিসিএস)*
- বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতার স্পৃহা, ক্রমবিকাশমান স্বাধীনতার চেতনা, রাজনৈতিক সংঘটন, ১৯৭৪ হতে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত এবং বিশেষভাবে ২৬ মার্চ ১৯৭১ এর ঘটনাপ্রবাহ সমন্বিত করে কিভাবে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলো তা বর্ণনা করুন। *(২৯তম বিসিএস)*
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ের ওপর আলোকপাত করুন। *(২৮তম বিসিএস)*

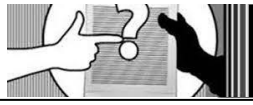

যেভাবে প্রশ্ন হতে পারে

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ের ওপর আলোকপাত করুন।
২. ২৬ মার্চ ১৯৭১ এর ঘটনাপ্রবাহ সমন্বিত করে কিভাবে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলো তা বর্ণনা করুন।
৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংস্কৃতির অবদান আলোচনা করুন।
৪. ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ দলিলের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৫. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
৬. বাংলাদেশের অভ্যুদ্বয়ের পেছনে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কি কারণ ছিল তা বিশ্লেষণ করুন।
৭. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।
৮. মুজিবনগর সরকার বলতে কী বোঝেন? এ সরকারের গঠন-কাঠামো বর্ণনা করুন।
৯. বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস - আলোচনা করুন।
১০. স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যাহার কার্যক্রম-পর্যালোচনা করুন।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি : ১৯৪৭-১৯৭১

ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আর লাখো মা-বোনের সম্ভ্রমহানির মাধ্যমে অর্জিত যে স্বাধীনতা তা একদিনে আমাদের করায়ত্ত হয়নি। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তবেই অর্জন করেছি আমরা এ স্বাধীনতা। তাই মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য বুঝতে হলে আমাদেরকে এর পটভূমি জানা দরকার। মুক্তিযুদ্ধের পিছনের ইতিহাস যেমন তিক্ত তেমনি মধুরও। কেননা ইতিহাসের প্রতিটি পর্বে বাংলার জনগণ তাদের শক্তি, সাহস, শৌর্য এবং বীর্যের পরিচয় দিয়েছে। যখনই কোনো ক্রান্তিকাল এসেছে বাংলার দামাল ছেলেরা পিছনে না গিয়ে সগর্বে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি যদিও ব্যাপক এবং বিস্তৃত তবুও এটি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য হলো জাতীয় স্মৃতিসৌধ, যা সম্মিলিত প্রয়াস নামেও পরিচিত। এ স্মৃতিসৌধের রয়েছে সাতটি ফলক, যা স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ সাতটি পর্যায়ে হলো-

ক. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন;

খ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচন;

গ. ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র আন্দোলন;

ঘ. ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন বা শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন;

ঙ. ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলন;

চ. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং

ছ. ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। এ সাতটি পর্যায়ের ইতিহাস নিম্নরূপে আলোচনা করা যায়।

ক. **বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণ :** ১৯৪৮ সালের মার্চে ঢাকায় আসেন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। তিনি ঢাকায় ছাত্র-জনতার উদ্দেশ্যে বলেন "Only Urdu and Urdu shall be the state language of Pakistan" বাঙালী ছাত্র সমাজ সাথে সাথেই জিন্নাহর এই ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং এর মাধ্যমেই সূত্রপাত হয় ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালী জাতির স্বাধীকার আন্দোলনের সূত্রপাত এবং বাংলার মাটিতে পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনেরও শুরু এখান থেকেই।

খ. **১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন :** ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ববাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাপ্ত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে তা অনুষ্ঠিত হলেও, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা তখনও কার্যকর ছিল। প্রাদেশিক পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯। এর মধ্যে ২৩৭টি আসন (৯ টি মহিলাসহ) মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য এবং ৭২টি আসন (৬টি মহিলাসহ) অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ১৫ টি মহিলা আসনের মধ্যে ৯ টি মুসলমান, ১ টি বর্ণ হিন্দু এবং দুটি তফসিলি হিন্দু ১ টি পাকিস্তানি খ্রিষ্টান এবং ২ টি বৌদ্ধ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। ৫৪-এর এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং ফ্রন্টের হাতে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় হয়।

যুক্তফ্রন্ট গঠন : যুক্তফ্রন্ট গঠন ছিল একটি প্রধান নির্বাচন কৌশল। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগ ছিল এর মূল উদ্যোক্তা। এর শরিক দলসমূহ হচ্ছে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টি (১৯৫৩), মাওলানা আতাহার আলীর নিজাম-ই-ইসলাম এবং হাজী মোহাম্মদ দানেসের নেতৃত্বাধীন গণতন্ত্রী দল। মধ্যপন্থি, গণতন্ত্রী, বামপন্থি ইত্যাদি দল নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সত্যিকার অর্থে একটি ব্যাপকভিত্তিক জোটের রূপ লাভ করে। মুসলিম লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানি আধিপত্য-এ দুয়ের বিরোধিতা ছিল জোটের সাধারণ ভিত্তি।

প্রধান নির্বাচনী ইস্যু : 'রাষ্ট্রভাষা প্রশ্ন ও পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবি' ছিল যুক্তফ্রন্টের প্রধান নির্বাচনী ইস্যু। এছাড়া যুক্তফ্রন্টের নেতারা তাদের নির্বাচনী প্রচারে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে লবণ কেলেঙ্কারির ঘটনা সম্মুখে নিয়ে আসেন। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের সুনির্দিষ্ট কোনো আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি ছিল না। যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে এ দলের প্রচারণায় 'ইসলাম বিপন্ন', পাকিস্তান বিপন্ন', 'কমিউনিস্ট', 'ভারতীয় চর' ইত্যাদি বক্তব্য প্রাধান্য পায়।

১৯৫৪ সালের সালের নির্বাচনের ফলাফল (মুসলিম আসন) : যুক্তফ্রন্ট- ২২৩; মুসলিম লীগ- ৯ (নির্বাচনের পর একজন স্বতন্ত্র সদস্য মুসলিম লীগ যোগ দেন);

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন এবং নির্বাচন উত্তর ঘটনাবলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য : ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের শুধু ভরাডুবিই ঘটেনি, রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে পূর্ব বাংলা থেকে বস্তুত এ দলের উচ্ছেদ ঘটে। ২১ দফা কর্মসূচির নম্বর দফায় বর্ণিত পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা ইত্যাদি দাবি আরো জোরদার হয়ে ষাটের দশকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক পেশকৃত ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচিতে তা সুনির্দিষ্ট রূপ নেয়। ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে দ্বিতীয়বার ও চূড়ান্তভাবে মুসলিম লীদের উচ্ছেদ ঘটে। পাকিস্তান অর্জনের পর মুসলিম লীগের জন্য একটি জাতীয়তাবাদী প্লাটফর্ম থেকে কর্মসূচিভিত্তিক প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক দলে নিজেকে রূপান্তর করা অত্যাবশ্যকীয় ছিল। মুসলিম লীগ তা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। বরং শীঘ্রই এ দল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থের হাতিয়ারে পরিণত হয়। '৫৪-এর নির্বাচনে পূর্ব বাংলার শোচনীয় পরাজয়ের পর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সচেষ্ট হয়। এরই অংশ হিসেবে ৫৬ দিনের মাথায় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষণা করা হয়। এ ঘটনা বাঙালিদের প্রচণ্ডভাবে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ৫৪-এর নির্বাচনের পূর্বাপর ঘটনা বাঙালিদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ. **১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন ও পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান :** ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা দেশের সামরিক শাসন জারি করেন। একই সাথে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ঘোষণা করা হয়। সেগুলো হচ্ছে-

১. সংবিধান বাতিল;
২. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বরখাস্ত;
৩. জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ ভেঙে দেয়া;
৪. সকল রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ;
৫. জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ।

সামরিক শাসনের কারণ : সামরিক শাসনের পরপরই প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা উদ্ভূত পরিস্থিতি তুলে ধরে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। তিনি একের পর এক সরকার গঠন এবং তার অস্থায়িত্ব, অবাধ দুর্নীতি, রাজনৈতিক কোনো উন্নতি ঘটার সম্ভাবনা না থাকা প্রভৃতি বিষয়কে সামরিক শাসনের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। সামগ্রিক অবস্থার জন্য তিনি রাজনীতিদের সরাসরি দায়ী করে বলেন, 'আমি একজন নীরব দর্শক হিসেবে দেশ ধ্বংসের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করতে পারি না। এ কথা ঠিক যে, ঘনঘন সরকার পরিবর্তন এবং রাজনীতিকদের মধ্যে ক্ষমতার জন্য চরম দ্বন্দ্ব ও বিভেদের কারণে দেশের মানুষ অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাই বলে এ কারণে সামরিক শাসন জারি হয়নি, সামরিক শাসন জারির ক্ষেত্রে এ পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সুযোগ নেয়া মাত্র। তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের গণতন্ত্র চর্চার প্রাথমিক ক্ষেত্রে এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ সত্ত্বেও শাসনতন্ত্র রচনাসহ কিছু রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়। তবে উদ্ভূত অবস্থা সৃষ্টিতে ইস্কান্দার মির্জা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কূট প্রকৃতির এবং ক্ষমতালিপ্সু। নিজ স্বার্থ উদ্ধার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে কোনো ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়া, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে কোন্দল-বিভেদ সৃষ্টি ছিল তার কৌশল। পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা যতই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, ততই সামরিক, বেসামরিক আমলাগোষ্ঠী ও তাদের প্রতিভূ ইস্কান্দার মির্জা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। বিশেষ ব্যবস্থা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে পাকিস্তান রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র বনাম সিভিলিয়ান দ্বন্দ্ব কার্যত বাঙালি বনাম কার্যত বাঙালি বনাম পাঞ্জাবি দ্বন্দ্বে রূপ নেয়। এ দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্টি হয় পূর্ব পাকিস্তানের তুমুল আন্দোলনের, যা পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের পথকে অনেকখানি ত্বরান্বিত করে। আন্দোলনের ফলে ইস্কান্দার মির্জা সরকারের ভিত নড়ে ওঠে। বাঙালি বৃহত্তর আন্দোনের প্রস্তুতি নিতে থাকে।

ঘ. **১৯৬২-এর ছাত্র আন্দোলন :** ৩টি প্রধান বিষয়কে কেন্দ্র করে '৬২-এর আইয়ুব শাসন বিরোধী ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। বিষয়গুলো হচ্ছে- ১. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রেপ্তার, ২. '৬২-এর আইয়ুবী শাসনতন্ত্র, ও ৩. শরিফ কমিশন রিপোর্ট।

১. **সোহরাওয়াদী গ্রেপ্তার ও ছাত্র সমাজের প্রতিক্রিয়া :** ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি আইয়ুব সরকার আকস্মিকভাবে করাচিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়। প্রকৃতপক্ষে, আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে কিভাবে আন্দোলন গড়ে তোলা যায় এ নিয়ে সোহরাওয়ার্দী এ সময়ে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। এ ব্যাপারে কারো কারো সাথে তিনি কথাবার্তাও শুরু করেছিলেন। বিশেষ করে আইয়ুব প্রস্তাবিত নতুন শাসনতন্ত্র প্রণীত হওয়ার সাথে সাথে যাতে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যায়, সোহরাওয়ার্দীর দৃষ্টি ছিল সেদিকে। সোহরাওয়ার্দীর গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে প্রথম প্রকাশ্যে আইয়ুব সামরিক শাসন বিরোধী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। লৌহ মানব আইয়ুব এত ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠার কথা ভাবতে পারেনি। এ ছাত্র আন্দোলন তার ক্ষমতার ভিত কাঁপিয়ে দেয়। ১৯ আগস্ট (১৯৬২) সোহরাওয়ার্দীকে মুক্তি দেয়া হয়।

২. **আইয়ুবী শাসনতন্ত্র বিরোধী ছাত্র আন্দোলন :** ১৯৬২ সালের ১ মার্চ বিচারপতি শাহাবুদ্দীন কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পাকিস্তানের জন্য একটি নতুন শাসনতন্ত্র জারি করেন। এটি আইয়ুবী শাসনতন্ত্র নামে পরিচিত। আইয়ুবের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রিত স্তরভিত্তিক পরোক্ষ নির্বাচনে পদ্ধতি সম্বলিত মৌলিক গণতন্ত্রের ধারণার ওপর এ সংবিধান প্রণীত হয়। গণতন্ত্রবিরোধী, এক ব্যক্তিনির্ভর, কেন্দ্রীভূত এ গণতন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানে সেনা-আমলা শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান। নতুন সংবিধানের আওতায় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যথাক্রমে ২৮ এপ্রিল ও ৫ মে (১৯৬২)। মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোট অনুষ্ঠিত হয়। আইয়ুব প্রবর্তিত এ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক এলিটদের অংশগ্রহণের প্রায় সকল সুযোগই বন্ধ হয়ে যায়। নতুন শাসনতন্ত্র জারি হওয়ার সাথে সাথে পূর্ব বাংলা আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। ছাত্র সমাজ এ শাসনতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করে। রাজবন্দীদের মুক্তি এবং একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানের দাবিতে তারা সোচ্চার হয়।

৩. **শরিফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বিরোধী ছাত্র আন্দোলন :** একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য ১৯৫৯ সালের ৫ জানুয়ারি আইয়ুব খান শিক্ষা সচিব ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক এস এম শরিফকে প্রধান করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করেন। ১৯৬২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এ রিপোর্টে বলা হয় ষষ্ঠ থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ইংরেজি পাঠ বাধ্যতামূলক, উর্দুকে জনগণের ভাষায় পরিণত করা, জাতীয় ভাষার জন্য একটি সাধারণ বর্ণমালা প্রবর্তনের চেষ্টা এবং সেক্ষেত্রে আরবির গ্রহণযোগ্যতা বিচেনা করা, রোমান বর্ণমালার সাহায্যে পাকিস্তানি ভাষাসমূহকে অক্ষরান্তের প্রচেষ্টা, শিক্ষাব্যয়কে বিনিয়োগ হিসেবে দেখে শিক্ষার্থীর তা বহন করা, অবৈতনিক শিক্ষার ধারণাকে 'অবাস্তব কল্পনা' বলে উল্লেখ করা, ডিগ্রি কোর্সকে তিনবছর মেয়াদি করা ইত্যাদি। শরিফ কমিশন রিপোর্টকে ছাত্রসমাজ গণবিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল, শিক্ষা সংকোচন, শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে গণ ও ব্যয়বহুল, বাংলাভাষার বিরুদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে তা প্রত্যাখ্যান করে। এ রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে পূর্ব বাংলার ছাত্ররা ব্যাপক সভা-সমাবেশ, প্রচারণা, মিছিল, ধর্মঘট চালিয়ে যেতে থাকে। দ্রুত এ আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় নির্বিশেষে সর্বস্তরের ছাত্ররা এতে অংশগ্রহণ করে। আন্দোলন সর্বদলীয় রূপ নেয়। শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র করে এত বিশাল আন্দোলন পূর্বে আর কখনো হয়নি। ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ছাত্রসমাজ সমগ্র পূর্ব বাংলায় হরতাল আহ্বান করে। ছাত্রদের একটি জঙ্গি মিছিল কার্জন হলের দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ অতর্কিত গুলিবর্ষণ করে। ফলে ঘটনাস্থলেই অনেকে নিহত হয়। এতে ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ৩ দিনব্যাপী শোক কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ২৪ সেপ্টেম্বর পল্টন ময়দানে এক সর্বদলীয় ছাত্র জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর সরকার শরিফ কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন স্থগিত রাখার ঘোষণা দেয়। ছাত্র অভ্যুত্থানের কারণেই সরকার তা করতে বাধ্য হয়।

ঙ. **১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলন :** (১৯ থেকে ২১ নং পৃষ্ঠা দেখুন)

চ. **১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান :**

১. **উনসত্তরের গণ আন্দোলন :** আগরতলা মামলা শুরু হওয়ার পর থেকেই পূর্বক বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হতে থাকে। ১৯৬৮ সালের জুন থেকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সাত আট মাস ধরে এ মামলার শুনানি ও জেরার কাজ চলেছিল। এ সকল শুনানির বিবরণ প্রত্যেক দিন পত্রিকায় প্রকাশিত হত। ঐ বিবরণী পাঠ করে বাংলার মানুষ জানতে পারল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগণ পূর্ব বাংলাকে কি রকম পাশবিকভাবে শোষণ করছিল। তারা আরো বুঝতে পারল যে পাকিস্তানী কেন্দ্রীয় শাসকদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার দরুনই শেখ মুজিবুর রহমানকে আগরতলা মামলায় মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়েছে। এ অবস্থায় ১৯৬৮ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় এক অভূতপূর্ব গণজাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারিতে পূর্ব বাংলা ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের দুইটি গ্রুপ এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের একাংশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সর্বদলীয় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য এই সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার সঙ্গে আওয়ামী লীগের ৬ দফা সম্মিলিত হয়ে পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রাম পূর্ণাঙ্গ রূপ গ্রহণ করে।

২. **এগার দফা :** ১৯৬৯ সালের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবির মূল বিষয়গুলি ছিল নিম্নরূপ :

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি;

খ. ছাত্রদের শিক্ষা সংক্রান্ত ও অন্যান্য অধিকার সংক্রান্ত ১৭ টি দাবি, যথা- নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, ছাত্র বেতন হ্রাস, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা, মেডিকেল ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রভৃতি;

গ. সর্বজনীন ভোটের ভিত্তিতে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের প্রবর্তন;

ঘ. পূর্ব বাংলার জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন;

ঙ. পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোকে নিয়ে একটি সাব-ফেডারেশন গঠন এবং তার অন্তর্গত প্রদেশগুলোকে স্বায়ত্ত শাসন প্রদান;

চ. ব্যাংক, বীমা ও সব বড় শিল্পকে জাতীয়করণ করা;

ছ. কৃষকদের উপর থেকে খাজনা ও ট্যাক্সের হার কমানো;

জ. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও বোনাস প্রদান;

ঝ. পূর্ব বাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঞ. জরুরী আইন, নিরাপত্তা আইন ও সকল নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করা;

ট. সিয়েটো, সেন্টো, পাকিস্তান-মার্কিন সামরিক চুক্তি প্রভৃতি বাতিল করে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করা;

৩. **গণ আন্দোলনের বিস্তার :** এগার দফার দাবিগুলোতে সমাজের সব স্তরের মানুষের দাবি সন্নিবেশিত হয়েছিল। ছয় দফা দাবির মূল বিষয়সমূহও এগার দফা দাবিনামার তিন নম্বর দাবির উপধারারূপে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। ১৯৬৯-এর জানুয়ারিতে যখন মূলত ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহযোগিতায় গঠিত ছাত্র সংগ্রাম কমিটি গণআন্দোলনের ডাক দেয় তখন সারা দেশের জনগণ ও ছাত্র সমাজ সে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। দেশের জনমত তখন এমন তীব্রভাবে আন্দোলনমুখী হয়ে উঠেছিল যে জানুয়ারির (১৯৬৯) তৃতীয় সপ্তাহে সরকারি ছাত্র সংগঠন হিসাবে পরিচিত এন. এস. এফ দলেও ভাঙ্গন ধরে এবং এর একাংশ এগার দফা আন্দোলনে যোগ দেয়। ঐ সময়ে পুরো গণআন্দোলনটাই পশ্চিম পাকিস্তানী শোষণের হাত থেকে মুক্তি লাভের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল। ১১ দফা দাবিতে ১৮ জানুয়ারি হতে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে। এদিকে পুলিশী নির্যাতনও পূর্ণমাত্রায় চলতে থাকে। ২০ জানুয়ারি ছাত্র বিক্ষোভের তৃতীয় দিবস। ঐ দিন ঢাকার ছাত্র জনতার উপর পুলিশের জুলুম চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। ছাত্রদের এক মিছিলের উপর নির্বিচারে গুলী চালান হয়। পুলিশের গুলীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামান নিহত হয়। ক্রমান্বয়ে এই ছাত্র আন্দোলন একটি গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত এই গণবিক্ষোভকে দমন করার জন্য শাসক গোষ্ঠী সামরিক বাহিনীকে তলব করে। কিন্তু সেনাবাহিনী প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে গুলী চালিয়ে জনগণের এই দুর্বার আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম হয়নি। এসময় পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনও শক্তিশালী হয়। অবশেষে এর নায়ক আইয়ুব খান বাধ্য হয়ে ফেব্রুয়ারিতে গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। তিনি 'ডাকের' (ডেকোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি) নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সমস্যা আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শেখ মুজিব তখনও আগরতলা মামলায় আটক। সুতরাং তাঁকে ছাড়া আলোচনা বৈঠক অনর্থক। এদিকে মওলানা ভাসানী গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। শেখ মুজিব প্যারোলে আলোচনায় অংশ নিতে অস্বীকার করেন। ইতোমধ্যে গণ-আন্দোলন আরও তীব্র হয়। আগরতলা মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে ১৫ ফেব্রুয়ারি বন্দী অবস্থায় কেন্টনমেন্টে গুলি করে হত্যা করা হয়। সার্জেন্ট জহরুল হকের মৃত্যু আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আর এক ধাপ এগিয়ে নেয়। জনতা সেদিন এতই ক্ষিপ্ত হয় যে তারা মামলার প্রধান বিচাকের বাড়ীসহ কয়েকজন মন্ত্রীর বাড়ি, গাড়ি ও গণ স্বার্থবিরোধী পত্রিকা অফিস অগ্নিদাহ করে। পরদিন খবর পাওয়া যায় যে, সৈন্যরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও রসায়ন বিভাগের রীডার ড. শামসুজ্জোহাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এই সংবাদে সারাদেশে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠে। শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। অবস্থা আয়ত্তে আনা ও জনগণকে শান্ত করার জন্য তিনি কৌশলের আশ্রয় নেন। গণদাবিতে প্রথমে তিনি পূর্ব বাংলার বিকৃত গভর্ণর মোনেম খানকে বরখাস্ত করেন এবং তৎস্থানে পূর্ব বাংলার অর্থমন্ত্রী ড. এম. এন. হুদাকে নিয়োগ করেন। শীঘ্রই তিনি দেশের জরুরী অবস্থা উঠিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। অতঃপর জনগণের রোষ হ্রাস করার জন্য ২১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঘোষণা করলেন যে তিনি আর প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হবেন না।

৪. **শেখ মুজিবকে গণসংবর্ধনা ও 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দান :** আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হতে মুক্তি লাভের পর শেখ মুজিবকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হতে রমনা রেসকোর্স ময়দানে ২৩ ফেব্রুয়ারি এক গণ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় শেখ মুজিবকে বাংলার নিপীড়িত জনগণের জন্য তাঁর ত্যাগ ও ভালবাসার নির্দশন স্বরূপ 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। শেখ মুজিব জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে ঘোষণা করেন, প্রস্তাবিত আলোচনা বৈঠকে তিনি অংশ গ্রহণ করে দেশবাসীর অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করবেন। যদি তারা উত্থাপিত দাবি অগ্রাহ্য করে তাহলে তিনি দেশব্যাপী শান্তিপূর্ণ গণ-আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

৫. **ফলাফল :** শেষ পর্যন্ত স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে সকল আলোচনা ব্যর্থ হয়। সঙ্গে সঙ্গে গণ ঐক্য ফ্রন্টও ভেঙ্গে যায়। ইতোমধ্যে আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অরাজনৈতিক কার্যকলাপ ও হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। আইন ও প্রশাসন ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ে। দেশের পরিস্থিতির ক্রমাবনতি রোধ করার জন্য শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়ার শরণাপন্ন হন। ২৫ মার্চ তিনি সমস্ত ক্ষমতা ইয়াহিয়ার নিকট হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন। আইয়ুব খান সমস্ত ক্ষমতা ইয়াহিয়ার নিকট হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ রাত্রে সারা দেশে দ্বিতীয় বারের মত সামরিক আইন জারী করেন। সঙ্গে সঙ্গে ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে ও জাতীয় পরিষদ বাতিল ঘোষিত হয়। তৎসঙ্গে দীর্ঘ দশ বছরের একনায়কতন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটে। অতঃপর শুরু হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তিম অধ্যায়ের নায়ক কলঙ্কিত ইয়াহিয়ার শাসনকাল।

ছ. **মুক্তিযুদ্ধ ও চূড়ান্ত বিজয় :** ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামীলীগ ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্র শুরু করে। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তার এই ঘোষণায় জাতি উদ্দীপ্ত হয় এবং পরবর্তীতে ২৫ মার্চ কালো রাতেই শুরু হয় নিরস্ত্র বাঙালির ওপর জল্লাদ বাহিনীর বর্বরোচিত নগ্ন হামলা। বন্দি হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে শেখ মুজিব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করে সকলকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মোকাবিলা করার আহ্বান জানান। টানা ৯ মাস যুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এ কে নিয়াজী ৯৩ হাজার সৈন্যসহ যৌথ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। অবশেষে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্থায়ী আসন লাভ করে।

যে কোনো বিষয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা অতি গুরুত্বপূর্ণ। পটভূমি না জানলে সে বিষয়ে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করাও দুরূহ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রয়েছে এক মহান ইতিহাস। এ ইতিহাস পুরোপুরি একটি রচনার পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া কোনো বিষয়ের ঐতিহাসিক পটভূমি লিখতে যাওয়া মানে নতুন করে আবার ইতিহাসের ছাত্র হওয়া। এটি যেমন কঠিন তেমনি দুরূহ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক পটভূমি জেনে সে অনুযায়ী অর্থাৎ তাদের আদর্শ অনুযায়ী দেশ গড়ার অঙ্গিকার করা বাঙালি হিসেবে আমাদের কর্তব্য। তাই সকল হানাহানি ভুলে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা, যে অঙ্গিকার, যে দৃপ্ত শপথ যে অনুযায়ী দেশ গড়ার অঙ্গিকার হওয়াই সকল বাঙালির প্রত্যাশা। তবেই আমরা জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব।

STUDENT STUDY

অসহযোগ আন্দোলন

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত চলমান অসহযোগ আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রথম পর্ব। নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন সামরিক সরকারের অযথা গড়িমসি ও প্রতারণা এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর অসহযোগিতা ছিল এ অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান কারণ। এ আন্দোলনের ব্যাপ্তি ছিল খুবই ব্যাপক এবং তাৎপর্যপূর্ণ। এই আন্দোলনের সাফল্যজনক পরিণতিতে বাঙালি জাতি যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

↘ অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট/পটভূমি

১. **১৯৭০ সালের নির্বাচন ও ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি:** ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি (মহিলা ১০টি সহ) আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি (মহিলা ৭টি সহ) আসন লাভ করে এবং ভুট্টোর পিপলস পার্টি ৮৮টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। তেমনি প্রাদেশিক পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানে ৩১০টি (মহিলা আসনসহ) আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়া ন্যায়সঙ্গত হলেও পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি শুরু করেন। এর সঙ্গে একমত পোষণ করে পিপলস পার্টি।

২. **ইয়াহিয়া-ভুট্টো-মুজিব ব্যর্থ আলোচনা:** নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানি শাসকচক্রকে হতাশ করে। ইয়াহিয়া চেয়েছিলেন যে কোনভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে এবং ভুট্টো চেয়েছিলেন আওয়ামী লীগকে দূরে সরিয়ে রেখে যেকোন মূল্যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ক্ষমতাধর হতে। অপরদিকে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ক্ষমতার বৈধ দাবিদার। এ তিন নেতার ত্রিমুখী অবস্থান পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ঢাকায় পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসার কথা ছিল। কিন্তু ভুট্টো চেয়েছিলেন আওয়ামী লীগকে পাশ কাটিয়ে সরকার গঠন করতে। শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফার ভিত্তিতে সরকার গঠনে তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি তিনি ঘোষণা করেন পাকিস্তানের কেউ ঢাকায় জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ দিলে তার নিজ দায়িত্বে তা করবেন। এর পেছনে তিনি কারণ হিসেবে নতুন সংবিধান প্রণয়ন তাঁর দলের মতামতকে প্রাধান্য প্রদানের দাবি ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানে তার ও নির্বাচিত অপরাপর সদস্যদের ওপর ভারতীয় হামলার অজুহাত দেখান। ফলে পরিস্থিতি অনেকটা রহস্যময় হয়ে ওঠে। এদিকে আওয়ামী লীগ ৬ দফার ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ও প্রাদেশিক আইনের খসড়া তৈরির কাজে অগ্রসর হতে থাকে। ১৮ ফেব্রুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টো পত্রিকায় এক চাঞ্চল্যকর বক্তব্য প্রকাশ করেন। এতে তিনি ঢাকা এসে আওয়ামী লীগের সাথে আপোষ আলোচনা অবাস্তব ও অসম্ভব ঘোষণা করেন। ২২ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো সংকট নিরসনে ৫ দফা 'ফর্মুলা' পেশ করেন। এতে তিনি সকল প্রদেশের জন্য সমান প্রতিনিধিত্বের দাবি তোলেন এবং এজন্যে কেন্দ্রে একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠনের কথাও বলেন।

ভুট্টোর এসব অসংলগ্ন বক্তৃতা-বিবৃতি পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। তাঁরা ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে আহ্বান জানান। এ অবস্থায় ২৭ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টিতে শেখ মুজিবুর রহমান-এর সভাপতিত্বে পাকিস্তানের খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করা হয়। একই দিন ভুট্টো জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পেছানো হলে তিনি যোগদান করবেন বলে ঘোষণা দেন। অন্যথায় তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে আন্দোলনের হুমকি দেন। এসময় ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর হুমকির কাছে নতি স্বীকার করে ১ মার্চ তারিখে হঠাৎ বেতার মাধ্যমে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।

৩. **ছাত্র ও শ্রমিকদের কর্মসূচি:** জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে পূর্ববাংলার ছাত্র সমাজ, শ্রমিক, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী তথা সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিভিন্ন জায়গায় জনতা পাক সেনাদের আক্রমণ করে। সংঘর্ষে বহুলোক নিহত ও আহত হয়। ঐদিন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাহজাহান সিরাজ এবং ডাকসুর সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে আ.স.ম. আব্দুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন- এ চার নেতা মিলে এক বৈঠকে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। এ ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে পরদিন দেশব্যাপী ছাত্রলীগ ও শ্রমিকলীগ ধর্মঘট আহ্বান করে। ঐদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক ছাত্র সমাবেশে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। সমাবেশে ছাত্রলীগ ৫ দফাভিত্তিক প্রস্তাব গ্রহণ করে। পল্টনে ঐদিন ছাত্রলীগ এক ইশতেহার ঘোষণা করে যা "স্বাধীনতার ইশতেহার" নামে চিহ্নিত হয়। এতে বলা হয়– "স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হয়েছে। ৫৪ হাজার ৫শত ৬ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার ৭ কোটি মানুষের আবাসিক ভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ রাষ্ট্রের নাম "বাংলাদেশ"।

পল্টন জনসভায় ৪ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন অর্ধবেলা হরতাল পালনের ঘোষণা দেয়া হয়। ছাত্র সমাজের ইশতেহারের প্রতি সমর্থন জানিয়ে দেশে শ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারি তথা আপামর জনতা সক্রিয়ভাবে হরতাল পালন করে। ঢাকা বেতার ও টেলিভিশন শিল্পীরা তাদের অনুষ্ঠান বর্জন করে। ছাত্রশিক্ষক, আইনজীবীগণ তাদের কর্মস্থল ত্যাগ করে আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এ তিনদিনের হরতালে ঢাকা সহ সমগ্র দেশে আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে পুলিশের গুলিতে বহু লোক আহত ও নিহত হয়। ইয়াহিয়া খান পরিস্থিতিতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে অগত্যা ৬ মার্চ তারিখে বেতার ভাষণে ঢাকায় ২৫ মার্চ পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। প্রেসিডেন্টের এ ঘোষণা পূর্ববাংলার বিক্ষুব্ধ মানুষকে আশ্বস্ত করতে পারে নি। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানও সে ঘোষণায় তৃপ্ত হতে পারেন নি। ফলে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণার জন্য বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়।

↘ অসহযোগ আন্দোলন-এর ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব

১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম থেকে আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। আর ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পরদিন থেকে দেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। নেতার ঘোষণা অনুযায়ী দেশের স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাকবাহিনী ও অফিসারদের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করতে থাকে। খাজনা-ট্যাক্স আদায় বন্ধ হয়ে যায়। ইয়াহিয়া খান পরিস্থিতির পূর্বানুমান করতে পেরে ৭ মার্চ জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করে পাঠান। কিন্তু বাঙালির দুর্দম্য শক্তি ও মনোবলের নিকট টিক্কা খান ব্যর্থতার পরিচয় দিতে থাকলেন। ১০ মার্চ সরকার এক সামরিক আদেশ জারি করে। এতে বলা হয় সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহে কোনো প্রকার বাধা প্রদান করা চলবে না এবং এতে কঠোর শাস্তির হুমকি প্রদান করা হয়। কিন্তু তাঁর এ হুমকি বাঙালিকে দমাতে পারে নি। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কর্মস্থলে যোগ দেয়ার কঠোর নির্দেশ দিলেও অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ১৩ মার্চ রেডিও পাকিস্তান করাচি কেন্দ্রের খ্যাতনামা বাংলা খবর পাঠক সরকার কবিরউদ্দিন রেডিও পাকিস্তান বর্জন করেন। স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদ এক বিবৃতিতে বার্মা ইস্টার্ন, এসো, পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েলস, দাউদ পেট্রোলিয়ামকে সেনাবাহিনীর ব্যবহারের জন্যে কোন প্রকার জ্বালানী ও তৈল সরবরাহ করতে নিষেধ করেন। ১৩ মার্চ সরকার পুনরায় সামরিক আইন জারি করে। ১৪ মার্চ ভুট্টো এক অবাস্তব প্রস্তাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার ফর্মুলা দেন। বঙ্গবন্ধু এসব কথায় কান না দিয়ে ১৪ মার্চ ৩৫ দফাভিত্তিক এক নির্দেশনামা জারি করেন।

বঙ্গবন্ধুর আদেশ জারির পর পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ মূলত অকেজো হয়ে যায়। কেবল সৈন্যবাহিনী ব্যতীত সর্বত্র বঙ্গবন্ধুর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অবস্থা উপলব্ধি করে ইয়াহিয়া ১৫ মার্চ ঢাকা সফরে আসেন এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দেন। বঙ্গবন্ধু প্রস্তাবে রাজি হলেও অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেননি। ১৬ মার্চ থেকে আলোচনা শুরু হয়। ২২ মার্চ হঠাৎ জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা আসেন এবং আলোচনায় অংশ নেন। ইতোমধ্যে ১৯ মার্চ জয়দেবপুরে নিরীহ মানুষের ওপর পাক সেনাদের হামলা ও হত্যা আলোচনাকে ব্যর্থ করে দেয়। ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া ও ভুট্টো ঢাকা ত্যাগ করেন। আর এদিনই মধ্যরাতে বাঙালির ওপর নেমে আসে চরম আঘাত। ওই কালোরাতে পাক সেনারা বহু বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা করে।

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের তাৎপর্য অপরিসীম। এ আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রস্তুতি পর্ব। এ আন্দোলন পাকিস্তান শাসনের ভীতকে দুর্বল করে দেয়। বাঙালি প্রমাণ করল তাদের নিকট পাক সরকারের নির্দেশের কোন মূল্য নেই। অপরদিকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ যে পূর্ববাংলায় কতটুকু গ্রহণযোগ্য তাই প্রমাণিত হলো। মূলত ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চের সামরিক হস্তক্ষেপ পর্যন্ত পাকিস্তানি প্রশাসন সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে এবং দেশ পরিচালিত হতে থাকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। তিনিই হয়ে ওঠেন সরকার প্রধান এবং তাঁর ধানমন্ডিস্থ বাসভবন পরিণত হয় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ১০ ডাউনিং স্ট্রিটের অনুরূপ। ৭ মার্চের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু একদিকে পাকিস্তানের শোষণ, অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি, কর্মসূচি, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ এবং প্রয়োজনে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে তাদের মোকাবেলার নির্দেশ দেন। এই ভাষণে তিনি স্বাধীনতার কথা এমনভাবে উচ্চারণ করলেন যাতে ঘোষণার কিছু বাকি রইল না, অন্যদিকে শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার ঘোষণা উত্থাপনের অভিযোগ গ্রহণও সহজ ছিল না। ফলে বাঙালি জাতি তাঁর এই বক্তৃতায় স্বাধীনতার বাণী পেয়ে স্থানীয় পর্যায়ে গড়ে তুলতে থাকে মুক্তিবাহিনী যারা ২৫ মার্চের আক্রমণের পর পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিরোধ করে। তাই ৭ মার্চের বক্তৃতা ও অসহযোগ আন্দোলন বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে শিক্ষা দিয়েছে। বলতে গেলে অসহযোগ আন্দোলন থেকে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস বঙ্গবন্ধুর ঐ ভাষণ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে 'বজ্রকণ্ঠ' নামে প্রচারিত হয় যা বাঙালিকে স্বাধীনতার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে।

STUDENT STUDY

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

↘ পটভূমি

১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠী এই দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব করতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যে-কোনভাবে ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদদের হাতে কুক্ষিগত করে রাখা। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে ১লা মার্চ এই অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করেন। এই সংবাদে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সারাদেশে একযোগে হরতাল পালিত হয়। তিনি ৩রা মার্চ পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় সমগ্র পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই পটভূমিতেই ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বিপুল সংখ্যক লোক একত্রিত হয়; পুরো ময়দান পরিণত হয় এক জনসমুদ্রে। এই জনতা এবং সার্বিকভাবে সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণটি প্রদান করেন।

↘ ভাষণ রেকর্ড

পাকিস্তান সরকার ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে ভাষণটি প্রচার করার অনুমতি দেয় নি। সরকারের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তৎকালীন পাকিস্তান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এ এইচ এম সালাহউদ্দিন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক একইসঙ্গে তৎকালীন ফরিদপুর জেলার পাঁচ আসনে সংসদ সদস্য এম আবুল খায়ের ভাষণটি ধারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাদের এ কাজে সাহায্য করেন তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের চলচ্চিত্র বিভাগের চলচ্চিত্র পরিচালক ও অভিনেতা আবুল খায়ের, যিনি ভাষণের ভিডিও ধারণ করেন। তাদের সঙ্গে তথকালীন তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রযুক্তিবিদ এইচ এন খোন্দকার ভাষণের অডিও রেকর্ড করেন।

অডিও রেকর্ডটি এম আবুল খায়েরের মালিকানাধীন রেকর্ড লেবেল ঢাকা রেকর্ড বিকশিত এবং আর্কাইভ করা হয়। পরে, অডিও ও ভিডিও রেকর্ডিংয়ের একটি অনুলিপি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হস্তান্তর করা হয় এবং অডিওর একটি অনুলিপি ভারতে পাঠানো হয়। সেইসাথে অডিওর ৩০০০ অনুলিপি করে তা সারা বিশ্বে ভারতীয় রেকর্ড লেবেল এইচএমভি রেকর্ডস দ্বারা বিতরণ করা হয়।

↘ স্বীকৃতি ও প্রতিক্রিয়া

২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কো ৭ই মার্চের ভাষণকে "ডকুমেন্টারী হেরিটেজ" (বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য) হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এই ভাষণটি সহ মোট ৭৭ টি গুরুত্বপুর্ণ নথিকে একইসাথে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ইউনেস্কো পুরো বিশ্বের গুরুত্বপুর্ণ দলিলকে সংরক্ষিত করে থাকে। 'মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে (এমওডব্লিউ) ' ৭ মার্চের ভাষণসহ এখন পর্যন্ত ৪২৭ টি গুরুত্বপূর্ণ নথি সংগৃহীত হয়েয়েছে।

↘ ভাষণের তাৎপর্য

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল একটি অগ্নিমশাল যা বিস্ফোরিত করেছিল মুক্তিযুদ্ধের দাবানল যার সামনে টিকতে পারেনি হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। জাতির জনকের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ শুধু বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়কেই নাড়া দেয়নি, ভাষণটি সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এ ভাষণের মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতিকে মুক্তির মোহনায় দাঁড় করিয়েছিলেন জাতির জনক। তিনি একটি ভাষণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ যখন আক্রমণাত্মক কর্মসূচি ঘোষণার পক্ষে তখন বঙ্গবন্ধু সারা দেশব্যাপী ধর্মঘট এবং অহিংস ও শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানান। ভাষণের সার্বিক বিষয় ও উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বঙ্গবন্ধু যখন চিন্তামগ্ন তখন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বলেছিলেন, "সামনে তোমার বাঁশের লাঠি, জনগণ আর পেছনে বন্দুক। এই মানুষদের তোমাকে বাঁচাতেও হবে। তুমি যা বিশ্বাস করো, সেই বিশ্বাস থেকেই আগামীকাল বক্তৃতা করবে।" কারণ বিদ্যমান আন্তর্জাতিক পটভূমিতে বাংলাদেশের সংগ্রাম কোন রূপ ধারণ করবে, এটা কি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত হবে, নাকি স্বাধীনতাকামী মুক্তি আন্দোলনের মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে, সেটা নির্ভর করছিল ৭ মার্চের ভাষণের দিক-নির্দেশনার ওপর। বঙ্গবন্ধু খুব সতর্কতার সঙ্গে বক্তৃতার মাঝখানে চারটি শর্ত আরোপ করে দিলেন। মার্শাল ল' প্রত্যাহার, সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফেরত নেয়া, নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা এবং যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে তার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা। এ ৪টি শর্ত দিয়ে একদিকে অলোচনার পথ উন্মুক্ত রাখলেন অপরদিকে বক্তৃতা শেষ করলেন এই কথা বলে যে, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" তিনি পপ্রকারান্তরে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেন।

ঢাকাস্থ মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড ঢাকায় অবস্থান করে পরিস্থিতির গুরুত্ব ও বঙ্গবন্ধুর ভাষণের তাৎপর্য ভালোভাবে অনুধাবন করে লিখেছেন, "রোববার ৭ মার্চ প্রদত্ত মুজিবের ভাষণে তিনি যা বলেছিলেন তার চেয়ে লক্ষণীয় হলো তিনি কি বলেননি। কেউ কেউ আশঙ্কা করছিলেন আবার কেউ কেউ আশা করেছিলেন যে, তিনি বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করবেন। এর বদলে বাঙালির মুক্তি ও স্বাধীনতার লক্ষে শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান তিনি জানালেন।" ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় ঘোষণা দেওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন, "You will see history made if the conspirators fail to come to their senses" আশ্চর্য, বঙ্গবন্ধু এই হুশিয়ারী উচ্চারণ বছর শেষ হতে না হতেই ফলে গিয়েছিল।

মূলত স্বাধীনতা সংগ্রাম স্বাধীনতা যুদ্ধের রুপ নেয় যখন ইয়াহিয়া - মুজিব বৈঠক চলাকালীন ২৫শে মার্চের কালরাতে জেনারেল টিক্কা খান "অপারেশন সার্চ লাইট" নামে নারকীয় গণহত্যা শুরু করে। ফলশ্রুতিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সশস্ত্রভাবে দমনের চেষ্টা হলে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সশস্ত্র রূপ ধারণ করলেও আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক সমর্থন এবং নৈতিক বৈধতা বাংলাদেশের পক্ষে চলে আসে। ১৯৭১ এর ৭ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ এই ১৮ দিনে এই ভাষণ বাংলাদেশের সাত কোটি মানুষকে প্রস্তুত করেছে মুক্তির সংগ্রামে, স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি প্রাজ্ঞ ও কৌশলী ভাষণ। তাই পৃথিবীর অনেক রাষ্টবিজ্ঞানী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গবেষক ৭ মার্চের ভাষণকে নিয়ে করেছেন বহুমাত্রিক আলোচনা। বিশেষত দু'টি ভাষণের সঙ্গে তারা তুলনা করে থাকেন, যার একটি ১৮৬৩ সালের আব্রাহাম লিংকনের 'গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস', তবে ভাষণটি ছিল পূর্বপরিকল্পিত ও লিখিত ২৭২ শব্দের দুই মিনিটের ১৫ থেকে ২০ হাজার মানুষের সামনে। অপরটি ১৯৬৩ সালের মার্টিন লুথার কিংয়ের 'আই হ্যাভ অ্য ড্রিম', ভাষণটির প্রথমাংশ লিখিত ও পঠিত যা ১৬৬৬ শব্দের ১৭ মিনিটব্যাপী এবং শ্রোতার সংখ্যা ছিল প্রায় দুই লাখ। এছাড়াও অনেকের গবেষণায় তৎকালীন সমসাময়িক আরও দুটো ভাষণ তুলনায় উঠে এসেছে। ১৯৪০ সালের উইনস্টন চার্চিলের 'উই শ্যাল ফাইট অন দ্য বিচেস', ভাষণটি ৩৭৬৮ শব্দের ১২ মিনিট ১৬ সেকেন্ডব্যাপী যা শুধুমাত্র আইনসভার ৬০০ মানুষের সামনে দেওয়া হয়েছিল এবং ১৯৪৭ সালের জওহরলাল নেহেরুর 'অ্যা ট্রাইস্ট উইথ ডেস্টিনি', ভাষণটি ৭৫৫ শব্দের পাঁচ মিনিট নয় সেকেন্ডব্যাপী সেটিও সংবিধান পরিষদের ৫০০ মানুষের সামনে দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণটি ছিল তাৎক্ষণিক, উপস্থিত ও অলিখিত। ১৮ মিনিট স্থায়ী ভাষণটি ১০৯৫ শব্দ-বুলেটের মালা গেঁথে জয় বাংলা শ্লোগান দিয়ে শেষ করেন। ১০ লক্ষাধিক বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের সামনে পাকিস্তানি হানাদারদের কামান-বন্দুক-মেশিনগানের হুমকির মুখে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে প্রদান করেন। ভাষণটি ছিল তার হৃদয়ের গভীরে যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস থেকে উৎসারিত। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ক্ষমতাবান সরকারসমূহ ও বিশ্বসম্প্রদায় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিল। ১৯৭৪ সালে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী শন ভ্যাকব্রাইড বলেছেন, "শেখ মুজিবুর রহমান বুঝতে পেরেছিলেন, কেবল ভৌগলিক স্বাধীনতাই যথেষ্ঠ নয়, প্রয়োজন মানুষের মুক্তি,

বেঁচে থাকার স্বাধীনতা। সাম্য ও সম্পদের বৈষম্য দূর করাই স্বাধীনতার সমার্থ। আর এ সত্যের প্রকাশ ঘটে ৭ মার্চের ভাষণে।" অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন বলেছেন, "তিনি ছিলেন মানব জাতির পদ প্রদর্শক। তাঁর সাবলীল চিন্তাধারার সঠিক মূল্য শুধু বাংলাদেশ নয় সমস্ত পৃথিবীও স্বীকার করবে।" পশ্চিমবঙ্গের প্রয়াত সাবেক মূখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছেন, "৭ মার্চের ভাষণ একটি অনন্য দলিল। এতে একদিকে আছে মুক্তির প্রেরণা। অন্যদিকে আছে স্বাধীনতার পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা।" কিউবার অবিসংবাদিত নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছেন, "৭ মার্চের শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ শুধুমাত্র ভাষণ নয়, এটি একটি অনন্য রণকৌশলের দলিল।" গ্রেট ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ বলেছেন, "পৃথিবীর ইতিহাসে যতদিন পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম থাকবে, ততদিন শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণটি মুক্তিকামী মানুষের মনে চির জাগরুক থাকবে। এ ভাষণ শুধু বাংলাদেশের মানুষের জন্য নয়, সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের অনুপ্রেরণা।"

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রভাবশালী গণমাধ্যমেও এ ভাষণকে একটি যুগান্তকারী দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। 'নিউজউইক' সাময়িকীর বিখ্যাত রিপোর্ট, যেখানে বঙ্গবন্ধুকে অভিহিত করা হয়েছিল 'পোয়েট অব পলিটিকস্' হিসেবে। "৭ মার্চের ভাষণ কেবল একটি ভাষণ নয় একটি অনন্য কবিতা। এই কবিতার মাধ্যমে তিনি 'রাজনীতির কবি হিসেবে স্বীকৃতি পান।" ১৯৯৭ সালে টাইম ম্যাগাজিনে বলা হয়েছে, "শেখ মুজিব ৭ মার্চের ভাষণের মাধ্যমেই আসলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ঐ ভাষণে গেরিলা যুদ্ধের কৌশলও ছিল।" বিবিসি ১৯৭১- এর মতে "পৃথিবীর ইতিহাসে জন আব্রাহাম লিংকনের গেটিস বার্গ ভাষণের সঙ্গে তুলনীয় এই ভাষণটি। যেখানে তিনি একাধারে বিপ্লবী ও রাষ্ট্রনায়ক।" থমসন রয়টার্স ১৯৭১-এর মতে "বিশ্বের ইতিহাসে এ রকম আর একটি পরিকল্পিত এবং বিন্যস্ত ভাষণ খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে একই সংগে বিপ্লবের রূপরেখা দেয়া হয়েছে এবং সাথে সাথে দেশ পরিচালনার দিকনির্দেশনাও দেয়া হয়েছে।" একই সালে এএফপি বলেছে, "৭ মার্চের ভাষণের মধ্যদিয়ে শেখ মুজিব আসলে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তিনি বাঙালিদের যুদ্ধের নির্দেশনাও দিয়ে যান। ঐ দিনই আসলে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।" দ্যা ওয়াশিংটন পোস্ট ১৯৭১-এর এক ভাষ্যে বলা হয়, "শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণই হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার মৌলিক ঘোষণা। পরবর্তীতে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছে ঐ ভাষণেরই আলোকে।" আনন্দবাজার পত্রিকা' ১৯৭২ এক নিবন্ধে বলা হয়, "উত্তাল জনগ্রোতের মাঝে, এ রকম একটি ভারসাম্যপূর্ণ, দিকনির্দেশনামূলক ভাষণই শেখ মুজিবকে অনন্য এক ভাবমূর্তি দিয়েছে। দিয়েছে অনন্য মহান নেতার মর্যাদা।"

সম্প্রতি ইউনেস্কো মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে 'মেমোরি অফ দা ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে' যুক্ত করেছে। বিশ্বের প্রামাণ্য ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হল ভাষণটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ভাষণ। পৃথিবীর কোনো ভাষণ কোনো দেশে এতবার প্রতিধ্বনিত হয়নি। ভাষণটি ১২টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়! এই ভাষণটি কালজয়ী যুগোত্তীর্ণ ভাষণ। যুগে যুগে এ ভাষণ নিপীড়ত, লাঞ্ছিত স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রেরণা ও উদ্দীপনার উৎস হিসাবে কাজ করবে। পৃথিবীর ইতিহাসে যতদিন পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম থাকবে, ততদিন শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণটি মুক্তিকামী মানুষের মনে চির জাগরুক থাকবে।

BCS প্রশ্নাবলী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

☑ বাংলাদেশের অভ্যুদ্বয়ের পেছনে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কি কারণ ছিল তা বিশ্লেষণ করুন।

মুক্তিযুদ্ধের কারণ

ক. সামাজিক কারণ

১. **ভৌগোলিক বৈপরীত্য :** ১৯৪৭ সালের আগস্টে ভারত ও পাকিস্তান নামে স্বাধীন দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করে ইংরেজরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করে। ১২শ মাইল ভারতীয় ভূ-খণ্ডের দুপ্রান্তে দুই অংশের অবস্থান। একমাত্র ধর্ম ছাড়া দুই অংশের জনগণের মধ্যে আর কোনো মিল ছিলনা। উভয় অংশেই মুসলমানরা ছিল ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ। অথচ তাদের ভাষা, জাতিগত মিশ্রণ, জীবধারনের রীতিনীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একে অপরের চেয়ে ভিন্ন। তাই একই দেশের দুই প্রদেশ হয়েও পূর্ব পাকিস্তান তার স্বতন্ত্র পরিচয়ে পরিচিত হতে স্বাভাবিক ভাবেই প্রয়াস পায়।

২. **ভাষাগত বৈষম্য :** পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনালগ্ন থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণের ভাষা নিয়ে বৈষম্যের সৃষ্টি করে। পাকিস্তানের ৫৪.৬% জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা ছিল বাংলা। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আমাদের ভাষাকে হরণ করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেবার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। তাই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের মাতৃভাষাকেব প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ় প্রত্যয়ে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় এবং শাসকগোষ্ঠীর সব বেড়াজাল ছিন্ন করে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ভাষা আন্দোলনের এ ঐক্যবদ্ধ চেতনা এদেশের মানুষের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল।

৩. **সাংস্কৃতিক বৈষম্য :** পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই পাকিস্তানের নেতৃত্ব সাংস্কৃতিক মিশ্রণের এক কেন্দ্রীভূত নীতি গ্রহণ করে। এ নীতির চাপ অধিকমাত্রায় অনুভূত হয় পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব বাংলায় তথা পূর্ব পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের সম্পর্কে কতকগুলো ভুল ধারণা পোষণ করত। প্রথমত, বাঙালিরা পুরোপুরি মুসলমান নয়। দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি আদৌ ইসলামিক নয় এবং তৃতীয়ত, কাশ্মীর সম্পর্কে বাঙালিদের কোনো আগ্রহ নেই। এ বিশ্বাসগুলোকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে তারা সমাধান দিতে চেয়েছিল। এরই ফলশ্রুতিতে তারা এদেশের মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় মনোভাব এবং প্রথাগত আচরণের ওপর অনুচিৎ প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের যুব সম্প্রদায়, বুদ্ধিজীবী এবং সর্বোপরি আপামর জনসাধারণের মধ্যে তীব্র হতাশায় সৃষ্টি হয়। তাদের মনে চাপা অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়। এ হতাশা এবং অসন্তোষের তীব্র বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে।

৪. **শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য :** পশ্চিম পাকিস্তানের দূরভিসন্ধি মূলক পরিকল্পিত নীতির কারণে পূর্ব পাকিস্তানের স্কুলগামী ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা বাড়লেও স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পায়। অন্যদিকে পাকিস্তান সরকার একই সময়ে এ খাতে বিপুল পমিাণ অর্থ ব্যয় করে পশ্চিম পাকিস্তানে স্কুলের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪ গুণ বৃদ্ধি করে। পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন ধরনের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও অনেক বেড়ে যায়। স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি না করে তা সংকুচিত করার চেষ্টা করেছে।

খ. সামরিক কারণ

১. **ক্রমাগত সামরিক অভ্যুত্থান :** ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থান ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি অন্যতম কারণ। ১৯৫৮ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে। ক্ষমতা দখলের পর থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সামরিক কায়দায় এদেশের মানুষের উপর শোষণ চালাতে থাকে। তাই এ অঞ্চলের সাধারণ জনগণ মুক্তির জন্য দিশেহারা হয়ে পড়ে।

২. **সামরিক বৈষম্য :** পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক বৈষম্য ছিল পর্বত প্রমাণ। দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি সদর দফতরই স্থাপিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। অস্ত্র কারখানাগুলোও স্থাপন করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। সামরিক বাহিনীর চাকুরীগুলো ছিল প্রায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য একচেটিয়া। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৬৫ সালে মোট ১৭ জন জেনারেল, লেঃ জেনারেল ও মেজর জেনারেলের মধ্যে মাত্র ১ জন মেজর জেনারেল ছিলেন বাঙালি। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর অফিসার শ্রেণিতে

বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল যথাক্রমে ৫%, ১০%, ও ১৬%। পাকিস্তানের মোট বার্ষিক আয়ের ৭৫% ও পরে ৬০% ব্যয় হত প্রতিরক্ষা খাতে। আর এ অর্থের সিংহভাগ সুবিধা ভোগ করত পশ্চিম পাকিস্তানিরা।

৩. **১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ এবং পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তাহীনতা :** পাকিস্তান একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ। এ যুদ্ধের বিরাট শিক্ষা হলো- পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থা এবং সামরিক বাহিনী শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের। ভারতের সাথে যে কোনো সম্ভাব্য সংঘর্ষের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান ছিল অরক্ষিত। তাই যুদ্ধের পর বাঙালি নতুন জীবনের রূপরেখা অঙ্কন করল। জন্ম হলো ছয় দফা কর্মসূচির। মূলত এ ছয় দফার পথ ধরেই বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলন সামনের দিকে অগ্রসর হয়।

গ. রাজনৈতিক কারণ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল রাজনৈতিক। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পূর্ব-পাকিস্তান তথা পূর্ব-বাংলা রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার হতে থাকে। রাষ্ট্রভাষাকে কেন্দ্র করে সর্বপ্রথম যে রাজনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টির প্রয়াস নেওয়া হয় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল বানচাল ও ক্ষমতা হস্তান্তরের অনীহার মধ্য দিয়ে তা একটি রাজনৈতিক সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে রাজনৈতিক গতিধারা বিশ্লেষণ করলে মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক কারণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

১. **কেন্দ্রীয় সরকারকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিতকরণ :** পাকিস্তান রাষ্ট্রটির জাতীয় সংহতি জোরদার করার জন্য পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তান নিয়ে একটি আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা একান্ত অপরিহার্য ছিল। এক্ষেত্রে বাঙালিরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় তারা জনসংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রিয় সরকারের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের দাবি করলে তাদের সেই দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়।

২. **১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন :** আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে জোটবদ্ধ হতে উৎসাহিত করে। প্রভুত্বব্যঞ্জক সরকারের অবসানের জন্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী নেতৃবৃন্দের জোটবদ্ধ হতে উৎসাহিত করে। প্রভুত্বব্যঞ্জক সরকারের অবসানের জন্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট ও বিক্ষোভের মুখে সামরিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন এবং দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদকে গ্রেপ্তার করেন। এতে ছাত্র আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র ছীড়য়ে পড়ে।

৩. **ছয় দফা আন্দোলন :** আওয়ামীলীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ছয় দফাভিত্তিক যে দাবি উত্থাপন করেন তার ওপর ভিত্তি করে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে।

৪. **১৯৬৯'র গণঅভ্যুত্থান :** শেখ মুজিবসহ ৩৫ জনকে আসামী করে স্বৈরাচারী আইয়ুব খান সরকারের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করার মধ্য দিয়ে বাংলার ছাত্র-জনতা ১৯৬৯ সালের যে দুর্বার গণঅভ্যুত্থান গড়ে তোলে, আইয়ুব খান সরকারের পতন ঘটায় তা বাঙালিদেরকে একটি মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা দান করে। ১৯৬৯ সালে ১১ দফা দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সংগঠিত হয় ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান এই আন্দোলনে সামরিক বাহিনীর গুলিতে নিহত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-আসাদুজ্জামান, নবকুমার ইন্সটিটিউট এর নবম শ্রেণির ছাত্র মতিউর, সেনানিবাসে নিহত হন সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সামসুজ্জোহা। ছাত্র-শিক্ষকের রক্তভেজা এই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তীতে স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নেয়।

৫. **১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল বানচাল করার ষড়যন্ত্র :** ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ পূর্ব-পাকিস্তানের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসন লাভ করে এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০ টি আসনের মধ্যে ২৮৮ টি আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আওয়ামীলীগের কাছে হস্তান্তর না করে ইয়াহিয়া খান টালবাহানা শুরু করে। ফলে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণ গণ আন্দোলন শুরু করে।

৬. **শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ :** ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার যে ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেছিল তা বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

৭. **বাঙালির ওপর হত্যাযজ্ঞ :** ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সরকারের লেলিয়ে দেওয়া সামরিক বাহিনী পূর্ব-পাকিস্তানের নিরস্ত্র জনগণের ওপর বর্বর ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে এবং ২৬ মার্চ থেকে পুরোপুরি মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

ঘ. অর্থনৈতিক কারণ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম কারণ ছিল অর্থনৈতিক পটভূমি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী নানাভাবে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থনীতি ধ্বংস করে নিজেদের স্বার্থোদ্ধার করে। তাদের দৃষ্টিতে পূর্ব-পাকিস্তান ছিল একটি উপনিবেশ মাত্র। শিল্প প্রতিষ্ঠান, বীমা ও ব্যাংক, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশি দূতাবাসগুলোর হেড অফিস ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানে। ফলে

বাংলাদেশের অর্জিত মুদ্রা ক্রমাগত পশ্চিম-পাকিস্তানে পাচার হতো। এ মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক পক্ষপাতিত্বের জন্য বাংলাদেশে মূলধন গড়ে উঠতে পারেনি। এছাড়া নিম্নলিখিত কারণে অর্থনৈতিক বৈষম্যের পাহাড় গড়ে উঠে-

০১. **বিদেশি মুদ্রার ব্যবহার :** বাংলাদেশে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা পশ্চিম-পাকিস্তানে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছিল। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ব-পাকিস্তানকে পশ্চিম-পাকিস্তানের শিল্পজাত পণ্যের বাজার হিসেবে গণ্য করত। পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়ে না উঠায় পূর্ব-পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের ক্ষমতা নেই এ অজুহাতে এখানকার বৈদেশিক আয়-ব্যয় করা হতো পশ্চিম-পাকিস্তানে।

০২. **রপ্তানির তুলনায় আমদানি কম :** পূর্ব-পাকিস্তান যে পরিমাণে রপ্তানি করত আমদানি করত সে তুলনায় অনেক কম। ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেশি ছিল। পক্ষান্তরে, পশ্চিম-পাকিস্তানে রপ্তানির তুলনায় আমদানির পরিমাণ ছিল বেশি। ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময় আয়-এর হিসাব প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা ৫৯ ভাগ পূর্ব পাকিস্তান রপ্তানি করত এবং আমদানি করত শতকরা ৩০ ভাগ মাত্র। এ সামান্য অর্থের সিংহভাগ ভোগপণ্য আমদানিতে ব্যয় হওয়ায় উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হতো। পক্ষান্তরে পশ্চিম-পাকিস্তান আলোচ্য সময়ে শতকরা ৪১ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে এবং ব্যয় করে শতকরা ৭০ ভাগ।

০৩. **মূলধনের অভাব :** দেশ বিভাগের পর ভারত হতে আগত শিল্পপতিগণ তাদের পুঁজি পশ্চিম-পাকিস্তানে বিনিয়োগ করে। তাছাড়া মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকায় অতি সহজেই পূর্ব-পাকিস্তানের আয় পশ্চিম-পাকিস্তানে চলে যেত। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থ ও চেকের মাধ্যমে পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে আনতে হতো। ফলে পূর্ব-পাকিস্তানে মূলধন গড়ে উঠতে পারেনি।

০৪. **পাটের অন্যায্য দাম :** তৎকালীন পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান অবলম্বন ছিল পাট। পূর্ব-পাকিস্তানের উৎপাদিত পাট হতে বৈদেশিক মুদ্রার দুই-তৃতীয়াংশ আসত। অথচ পাটচাষীকে কোনো দিনই ন্যায্য দাম দেওয়া হয়নি। ফলে তাদের দরিদ্রতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

০৫. **কেন্দ্রীয় রাজধানী :** পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় রাজধানী জনবহুল পূর্ব-পাকিস্তানে স্থাপিত না হয়ে পশ্চিম-পাকিস্তানে স্থাপিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরাট অংশ সেখানেই খরচ হতো। কেন্দ্রীয় রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের সকল হেড অফিস, দেশরক্ষা সদর দফতর ও শিক্ষায়তন, স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনসমূহ, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ন্যাশনাল ব্যাংক, বীমা, অন্যান্য প্রায় সকল ব্যাংক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানাদিও পশ্চিম-পাকিস্তানে স্থাপিত হয়।

০৬. **বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য বণ্টনে অবিবেচনা :** বাংলাদেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ভিত্তিতে বিদেশ হতে বিপুল পরিমাণ ঋণ ও সাহায্য আসত এবং সেই ঋণের সুদ বাংলাদেশকেই বহন করতে হতো। অথচ বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের শতকরা ১০-১৫ ভাগ মাত্র বাংলাদেশের জন্য ব্যয় হতো। পাকিস্তানকে চীন ১৯৬৫ সালে ঋণ দেয় ৬০ মিলিয়ন ডলার। তন্মধ্যে মাত্র ১,২৫,০০০ ডলার পূর্ব-পাকিস্তানের পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা হয়।

০৭. **মাথাপিছু আয় বৈষম্য :** পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের তুলনায় পশ্চিম-পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বেশি ছিল এবং এ মাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল পূর্ব-পাকিস্তানের তুলনায় ৩২% বেশি। ১৯৬৯-৭০ সালে এ পার্থক্যের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ৬১%।

০৮. **রাজস্ব বণ্টনে অবিবেচনা :** দেশের দু'অংশের উন্নয়ন খাতে রাজস্ব বণ্টন কখনোই লোকসংখ্যা অনুপাতে করা হতো না। মোট রাজস্বের ৬০% আয় হতো পূর্ব পাকিস্তান থেকে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হতো মাত্র ২৫%। অপরপক্ষে, পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে আয় হতো ৪০%। অথচ সেখানে ব্যয় করা হতো ৭৫%।

০৯. **ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হেড অফিস :** বাংলাদেশে স্থাপিত এমন অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল যাদের হেড অফিস করাচিতে ছিল। এ প্রতিষ্ঠানগুলো করাচিতে কর প্রদান করত। ফলে পূর্ব-পাকিস্তান রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হতো।

১০. **উন্নয়ন খাতে অবিবেচনামূলক বরাদ্দ :** পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা আর্থিক বছর ফুরিয়ে যাওয়ার ঠিক আগেই দেওয়া হতো। ফলে প্রতি বছর অব্যবহৃত টাকা কেন্দ্রের হাতে ফেরত চলে যেত। পশ্চিম-পাকিস্তানের বেলায় আবার সেরূপ ঘটত না।

১১. **ব্যাংকের ঋণ :** পাকিস্তানের ব্যাংক জনসাধারণকে যে ঋণস্ত্রদান করত তার শতকরা মাত্র ৩৩ ভাগ পূর্ব-পাকিস্তান পেত। কৃষি উন্নয়নের জন্য পাকিস্তান কৃষি ব্যাংক ঋণ দেয় ৬০০ কোটি টাকা। এ ঋণের সিংহভাগ লাভ করেছে পশ্চিম-পাকিস্তানিরা।

১২. **বিদ্যুৎ উন্নয়ন ক্ষেত্রে বৈষম্য :** পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বিদ্যুৎ উন্নয়ন ক্ষেত্রে বৈষম্য নীতি অনুসরণ করেছিল। বিভিন্নভাবে পূর্ব-পাকিস্তানে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৭% ও ৮৩%।

১৩. **পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় :** পশ্চিম-পাকিস্তান বহির্ভূত বহু প্রকল্পে টাকা খরচ করা হয়। সেচ প্রকল্পের নামে পশ্চিম-পাকিস্তানে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে, পূর্ব-পাকিস্তানের কৃষি ভূমিকে সর্বনাশা বন্যার কবল থেকে রক্ষা করার জন্য কোনো পদক্ষেপই নেওয়া হয়নি।

১৪. **অর্থনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু ছিল পশ্চিম-পাকিস্তান :** কেন্দ্রিয় সরকারের সকল কার্যালয়, দেশ রক্ষা সদর দফতর ও শিক্ষাসহ স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন, পাকিস্তান আন্তর্জাতিক বিমান, ন্যাশনাল ব্যাংক, বীমা, কর্পোরেশনসমূহ, বৈদেশিক দূতাবাস, আন্তর্জাতিক ইত্যাদির ন্যায় সকল সরকারি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানাদির প্রধান কেন্দ্রগুলো অবস্থিত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। অথচ পূর্ব-পাকিস্তানের অর্জিত অর্থ দিয়ে এ সকল উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পশ্চিম-পাকিস্তানিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যাপারে কৃষি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রের ১৬টির মধ্যে ১৩টি পশ্চিম-পাকিস্তানে অবস্থিত ছিল।

১৫. **পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান :** ব্যবসা-বাণিজ্যের লাইসেন্স ও বৈদেশিক আমদানির সকল সুযোগ-সুবিধা পক্ষপাতমূলকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের দেওয়া হয়। বাংলাদেশে উৎপন্ন নিউজপ্রিন্ট ও অন্যান্য কাগজের ব্যবসার কর্তৃত্ব করত পশ্চিম-পাকিস্তানের ব্যবসায়ীরা। তাদের কারসাজিতে বাংলাদেশের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানীদের তুলনায় অধিক মূল্যে কাগজ ক্রয় করত। বিশেষ সুবিধা ভোগ করায় ব্যাংক ও বীমা শিল্পের যথাক্রমে ৮০ ভাগ ও ৭০ ভাগের মালিকানা তাদের হাতে ছিল।

১৬. **প্রশাসনিক বৈষম্য :** ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আমলা ছিলেন ৯৫ জন। এর মধ্যে বাঙালী ছিলেন মাত্র ৭ জন। ১৯৪৭-৬৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থায় প্রথম শ্রেণির বাঙালি কর্মকর্তা ছিলেন শতকরা ২০ ভাগ, দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মচারী ২৬ ভাগ, তৃতীয় শ্রেণীর ২৭ ভাগ এবং চতুর্থ শতকরা ৩০ ভাগ। সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের অংশ গ্রহণ ছিল নাম মাত্র। এ সকল বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ যৌক্তিক হয়ে পড়ে।

১৭. **চাকুরীক্ষেত্রে বৈষম্য :** পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে নিয়ন্ত্রণ করত। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে ৯৫ জন আই.সি.এস ও আই.পি. অফিসারের মধ্যে মাত্র ১ জন ছিলেন বাঙালি। ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় সচিবালয় মোট ১৯৩ জন সচিব, যুগ্মসচিব ও উপসচিবের মধ্যে বাঙালি ছিলেন মাত্র ১৩ জন এবং তাঁদের কেউ সচিবের পদে ছিলেন না। ১৯৬৪ সালের চিত্রটি ছিল কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের ১৭ জন সচিবের মধ্যে মাত্র ২ জন বাঙালি সচিব এবং সচিবালয়ের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের মধ্যে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল মাত্র ২১% ভাগ। পূর্ব বাংলায় শিক্ষার হার বেশী থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চ পদে নিয়োগের ব্যাপারে ছিল চরম বৈষম্য।

১৮. **শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য :** শিক্ষাক্ষেত্রেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে চরম অসম অবস্থা বিরাজমান ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পরবর্তী কয়েক বছর পাকিস্তান শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক অনগ্রসর ছিল কিন্তু ক্রমে ক্রমে পশ্চিম পাকিস্তান অনেক এগিয়ে যায়।

১৯. **আন্তঃপ্রদেশ বাণিজ্য বৈষম্য :** পশ্চিম পাকিস্তানে তৈরি দ্রব্যাদি পূর্ব পাকিস্তানে বিক্রি করা হতো এবং এভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের বাজারে পরিণত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান।

২০. **কৃষিক্ষেত্রে বৈষম্য :** কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অনুরূপ পক্ষপাতিত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে সরকারি অর্থ বণ্টন বরাবরই পশ্চিম পাকিস্তানকে অনুগ্রহ করেছে পূর্ব পাকিস্তানের বদৌলতে।

২১. **বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারে বৈষম্য :** ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের চীনের কাছ থেকে ৬০০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ গ্রহণ করে। এ থেকে মাত্র ১ লক্ষ ২৫ হাজার ডলার ব্যয় করা হয় পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে। অথচ এই ঋণ শোধ করা হয় পূর্ব পাকিস্তানের পাট রপ্তানির মাধ্যমে। এভাবে বিভিন্ন পর্বে বিদেশী সাহায্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান বৈষম্যের শিকার হয়। উদাহরণস্বরূপ সিন্ধু অববাহিকায় দু'টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তাবায়নে ব্যয় করা হয় ১৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সেক্ষেত্রে (১৯৪৯-৬৪) পাঁচ বছরে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হয় ১৪৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

STUDENT STUDY

মুজিবনগর সরকার

মুজিবনগর সরকার ছিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য গঠিত বাংলাদেশের প্রথম সরকার। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর ১০ এপ্রিল এ সরকার গঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমানের নামে বৈদ্যনাথতলা গ্রামের নামকরণ হয় মুজিবনগর। মুজিবনগর সরকারের কর্মকান্ড বাংলাদেশ ভূ-খন্ডের বাইরে থেকে পরিচালিত হয়েছিল বলে এ সরকার প্রবাসী সরকার হিসেবেও খ্যাত।

সরকার গঠন : ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড তথা প্রধান নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের মুক্তাঞ্চল বৈদ্যনাথতলায় সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আবদুল মান্নান এম.এন.এ এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী এম.এন.এ। নবগঠিত সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে এখানে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।

মন্ত্রীদের দপ্তর বণ্টন: ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল সরকার গঠন এবং ১৭ এপ্রিল সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হলেও মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন হয় ১৮ এপ্রিল। মুজিবনগর সরকারকে ১৫টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ভাগ করা হয়। এছাড়া কয়েকটি বিভাগ মন্ত্রিপরিষদের কর্তৃত্বাধীনে থাকে। মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- ✓ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি;
- ✓ সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি (রাষ্ট্রপতি পাকিস্তানে অন্তরীণ থাকার কারণে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের দায়িত্বপ্রাপ্ত);
- ✓ তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রীএবং প্রতিরক্ষা, তথ্য, সম্প্রচার ও যোগাযোগ, অর্থনৈতিক বিষয়াবলি, পরিকল্পনা বিভাগ, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য, শ্রম, সমাজকল্যাণ, সংস্থাপন এবং অন্যান্য যেসব বিষয় কারও ওপর ন্যস্ত হয়নি তার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী;
- ✓ খন্দকার মোশতাক আহমদ মন্ত্রী, পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
- ✓ এম মনসুর আলী মন্ত্রী, অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়;
- ✓ এ এইচ এম কামরুজ্জামান মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, সরবরাহ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং কৃষি মন্ত্রণালয়।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় : এস.এ সামাদ প্রতিরক্ষা সচিব। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এম.এ.জি ওসমানী, চীফ অব স্টাফ কর্নেল আবদুর রব, উপ-সেনাপতি এ.কে খন্দকার, এবং ডি.জি মেডিকেল সার্ভিস ও বিভিন্ন পদবীর স্টাফ অফিসার এ দপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় যুদ্ধরত অঞ্চলকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে প্রতিটিতে একজন করে সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ করা হয়। তবে ১০নং বা নৌ সেক্টরে কোন সেক্টর কমান্ডার ছিল না, কমান্ডোরা যখন যে এলাকায় অভিযান করত সে সেক্টরের কমান্ডারের অধীনে থাকত। এ ছাড়াও জেড ফোর্স, কে ফোর্স ও এস ফোর্স নামে তিনটি ব্রিগেড গঠন করা হয়। ব্রিগেডগুলির কমান্ডার হলেন যথাক্রমে মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ এবং মেজর কে.এম সফিউল্লাহ।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় : যুদ্ধের সময় বিদেশে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করে এবং বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে বহির্বিশ্বের সরকার ও জনগণের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে এ মন্ত্রণালয়। এ লক্ষে কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, স্টকহোম প্রভৃতি স্থানে কূটনৈতিক মিশন স্থাপন করা হয় এবং জাতিসংঘ, আফগানিস্তান, সিরিয়া-লেবানন, নেপাল, শ্রীলংকা, বার্মা, থাইল্যান্ড, জাপান প্রভৃতি দেশের সমর্থন আদায়ের জন্য কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। এছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে এ মন্ত্রণালয় থেকে পত্র প্রেরিত হয়। বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোর প্রধান ছিলেন কলকাতায় হোসেন আলী, দিল্লিতে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, ইউরোপে বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, ওয়াশিংটনে এম আর সিদ্দিকী। স্টকহোমে আবদুর রাজ্জাক বাংলাদেশ মিশনের প্রতিনিধিত্ব করেন।

বাংলাদেশ সরকার প্রেরিত কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সিরিয়া-লেবাননে মোল্লা জালাল উদ্দীন এমএনএ ও ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী, আফগানিস্তানে আবদুস সামাদ আজাদ, আশরাফ আলী চৌধুরী এমএনএ, মওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী ও এডভোকেট নূরুল কাদের। নেপালে প্রেরিত হন আবদুল মালেক উকিল, সুবোধচন্দ্র মিত্র ও আবদুল মোমিন তালুকদার। এডভোকেট ফকির শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে শামসুল হক ও জ্যোতিপাল মহাথেরো শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড ও জাপান গমন করেন। মাহবুব আলম চাষী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পররাষ্ট্র দপ্তর অবস্থিত ছিল কলকাতার ৯ সার্কাস এভিনিউতে।

অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় : এম মনসুর আলী এ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও খন্দকার আসাদুজ্জামান ছিলেন সচিব। যুদ্ধের সময় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কোন কাজ ছিল না। তবে অর্থ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করে: সরকারের আয়-ব্যয়ের বাজেট প্রণয়ন; বাংলাদেশের অভ্যন্তর ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত সম্পদের হিসাব তৈরি; বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গকে অর্থ প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন; আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা; রাজস্ব ও শুল্ক আদায়; এবং যেকোন আর্থিক অনিয়ম রোধের জন্য কমিটি গঠন।

বাংলাদেশ সরকার তার আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করে প্রথমে ছয় মাসের জন্য একটি বাজেট তৈরি করে। বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত অর্থ সংরক্ষণের জন্য ট্রেজারি স্থাপন করে এবং প্রবাসী বাঙালি ও বিভিন্ন বিদেশী নাগরিক ও সংস্থার তরফ থেকে প্রাপ্ত অর্থ বাংলাদেশ ফান্ড নামের একটি তহবিলে জমা হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের বেতন-ভাতা ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের পস্তাব প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মন্ত্রিসভায় উপস্থাপিত হত এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের কাছে সে অর্থ পৌঁছাত। সরকারি ব্যয়ের স্বচ্ছতার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়।

↘ মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় : মন্ত্রিপরিষদের সভায় বিভিন্ন পস্তাব উত্থাপন, সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং এসব বিষয়াদি লিপিবদ্ধকরণ মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের আওতাভুক্ত ছিল। মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হবার পর পরিষদের প্রথম দুই মাসের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকাংশই তাজউদ্দীন আহমদ নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করেন। এরপর এইচ টি ইমাম সচিব হিসেবে যোগ দেবার পর অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের সমনতয়ে সচিবালয় গঙে ওঠে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের সমন্বয় সাধনে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

↘ সাধারণ প্রশাসন বিভাগ : নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি ও চাকরির বিধি প্রণয়নের নিমিত্তে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের আওতায় সাধারণ প্রশাসন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রধানত দ্বিতীয় শ্রেণীর বিভিন্ন নিয়োগ এ বিভাগের আওতাধীন ছিল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তালিকা বহির্ভূত ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিতকরণ এবং বিভিন্ন নিয়োগের জন্য প্যানেল তৈরি করাও ছিল এ বিভাগের দায়িত্ব। নুরুল কাদের সংস্থাপন সচিবের দায়িত্ব পালন করেন।

↘ জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল : সাধারণ প্রশাসন বিভাগের আওতায় এ কাউন্সিল গঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনের পক্ষে দেশের অভ্যন্তরে প্রতিটি জেলায় সরাসরি কাজ করা অসম্ভব বিধায় কয়েকটি জেলার সমন্বয়ে একটি করে প্রশাসনিক জোন গঠন করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৭ জুলাই প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ৯টি জোন এবং পরবর্তী সময়ে আরও দু'টি জোন প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিটি জোনের একটি হেডকোয়ার্টার ছিল এবং একজন চেয়ারম্যান (এমএনএ বা এমপিএ) ও একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা জোনের দায়িত্ব পালন করেন। সংশ্লিষ্ট জোনের চেয়ারম্যান, সদস্য, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীদের সমন্বয়ে প্রশাসনিক কাউন্সিল গঠিত হয়।

দায়িত্ব ও কর্তব্য মন্ত্রিসভা কর্তৃক জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিলের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, জোনের ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তথা জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, উদ্বাস্তুদের ত্রাণ সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে ত্রাণ প্রদানের বিষয়টির সমন্বয় সাধন, যুব ক্যাম্পগুলোকে সাধ্যমত সহায়তা প্রদান এবং সেক্টর কমান্ডকে সহায়তা করা জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিলের প্রধান কাজ ছিল। মুক্তাঞ্চলে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন যে কার্যকর রয়েছে তা জনগণকে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করাও জোনাল প্রশাসনের দায়িত্ব ছিল। সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করে ৫ দিনের নোটিশে প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা সচিবকে মাসে কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হত।

↘ স্বাস্থ্য ও কল্যাণ মন্ত্রণালয় : এ মন্ত্রণালয় একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে প্রথম কাজ শুরু করে। পরবর্তী সময়ে মহাপরিচালককে সচিবের মর্যাদা দেয়া হয়। স্বাস্থ্য বিভাগের কাজ দুভাগে বিভক্ত ছিল: (ক) সেনাবাহিনী তথা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা ও (খ) বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ বা সরাসরি অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করে নি এমন জনগণকে চিকিৎসা প্রদান। এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিল, চিকিৎসক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ, ঔষধ-পথ্য সংগ্রহ, মাঠ পর্যায়ে চিকিৎসক দল প্রেরণ, শল্য চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, এবং আহত ও নিহতদের জন্য পরিবহণের ব্যবস্থা করা। ডা. টি হোসেন প্রথমে স্বাস্থ্য বিভাগের মহাপরিচালক এবং পরে স্বাস্থ্য ও কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব নিযুক্ত হন।

↘ তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় : মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচার-প্রচারণা এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে বসবাসরত বাঙালিদের মনোবল উজ্জীবিত রাখার প্রয়োজনে এ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ মন্ত্রণালয় প্রধানত চারটি মাধ্যমে এর কর্মকান্ড পরিচালনা করত: (ক) বেতার (স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র), (খ) চলচ্চিত্র, (গ) প্রকাশনা, (ঘ) চারুকলা ও ডিজাইন।

↘ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় : মুক্তাঞ্চল, শরণার্থী ক্যাম্প ও ট্রেনিং ক্যাম্পে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এ মন্ত্রণালয়ের প্রধান দায়িত্ব ছিল। মুক্তাঞ্চলে প্রশাসনিক কাঠামো তৈরির ব্যাপারে সরকারকে সহায়তা এবং যুদ্ধ এলাকা ও মুক্তাঞ্চলে গোয়েন্দা তৎপরতা পরিচালনার জন্য গোয়েন্দা বিভাগ গঠন করা হয়। এ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ পুলিশের পোশাক, ব্যাজ ও মনোগ্রাম নির্ধারণ করে। আবদুল খালেককে প্রথমে পুলিশের

আই.জি ও পরে স্বরাষ্ট্র সচিব নিয়োগ দেয়া হয়। যুদ্ধের শেষদিকে বাংলাদেশকে ৪টি রেঞ্জে ভাগ করে চারজন ডিআইজি ও প্রত্যেক জেলায় এসপি নিয়োগ করা হয়। ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশী জনগণের ভ্রমণ ডকুমেন্ট ইস্যু করাও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিল।

↘ ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ : ভারতে আশ্রয়প্রাপ্ত শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য স্বরাষ্ট্র ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। শরণার্থীদের আবেদন বিবেচনা করে তাদের সাধ্যমত সহায়তা প্রদান করা হত। ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা হয়: (ক) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটি এবং (খ) উদ্বাস্তু কল্যাণ বোর্ড।

↘ সংসদ বিষয়ক বিভাগ : পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে এ বিভাগ কাজ করে। প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদ সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং তাদের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করা এ বিভাগের প্রধান দায়িত্ব ছিল। মুক্তিযোদ্ধা বাছাই, শরণার্থীদের আবাসন ও যুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে পরিষদ সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এসব কর্মকান্ডের জন্য তাদের ভাতা প্রদান করা হত।

↘ কৃষি বিভাগ : যুদ্ধপরবর্তী সময়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ এবং যুদ্ধকালীন ক্ষতির বিবেচনায় কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে কিভাবে খাদ্য সংকট কাটিয়ে উঠা যায় সে বিষয়ে উদ্যোগ নেবার জন্য এ বিভাগ কাজ করে। নুরুদ্দিন আহমদ কৃষি সচিবের দায়িত্ব পালন করেন।

↘ প্রকৌশল বিভাগ : যুদ্ধে সেক্টরগুলোতে প্রকৌশল বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ করে দ্রুত রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত এবং সেতু মেরামতের জন্য কিছুসংখ্যক প্রকৌশলীকে এ বিভাগের অধীনে নিয়োগ করা হয়। এমদাদ আলী প্রধান প্রকৌশলী নিযুক্ত হন।

↘ পরিকল্পনা সেল : আওয়ামী লীগের ছয়দফা এবং ১৯৭০-এর নির্বাচনে এ দলের ইশতেহারের পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে দেশকে গড়ে তোলার জন্য, বিশেষ করে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি কিভাবে দ্রুত কাটিয়ে উঠা যায় সে বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সরকার এ সেল গঠন করে। পাকিস্তান শাসনামলে উন্নয়নবঞ্চিত এলাকা চিহ্নিতকরণ ও প্রশাসনিক পুনর্গঠন বিষয়ে পরামর্শ দেয়াও এর কাজ ছিল। প্রাথমিকভাবে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন, খাদ্য সরবরাহ, স্বাস্থ্য, পানি-বিদ্যুৎ ও বন্ধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান চালুর বিষয়ে এ সেল সরকারকে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দান করে। এ সেলই পরবর্তী সময়ে পরিকল্পনা কমিশনে রূপান্তরিত হয়। ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী চেয়ারম্যন এবং ড. খান সারোয়ার মুর্শেদ, ড. মোশাররফ হোসেন, ড. এস.আর বোস ও ড. আনিসুজ্জামান পরিকল্পনা সেলের সদস্য ছিলেন।

↘ যুব ও অভ্যর্থনা শিবির নিয়ন্ত্রণ বোর্ড : মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে আগ্রহী যুবকদের প্রথমে অভ্যর্থনা ক্যাম্পে এবং পরে সেখান থেকে যুবক্যাম্পে ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠানো হত। জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিলগুলোর আওতায় উভয় ক্যাম্প পরিচালিত হত। এ বোর্ডের চেয়ারম্যান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাহায্যে কর্মকান্ড পরিচালনা করতেন। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও আসাম রাজ্যে মোট ১০৬টি যুব ক্যাম্প ও ১১২টি অভ্যর্থনা ক্যাম্প ছিল। বোর্ডের পস্তাবের ভিত্তিতে সরকারের বাজেটেই উভয় ক্যাম্প পরিচালিত হয়। অধ্যাপক ইউসুফ আলী যুব ও অভ্যর্থনা শিবির নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। এছাড়া প্রতিটি ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন একজন করে এমএনএ বা এমপিএ।

পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ

পূর্ব পাকিস্তানের নির্যাতিত ও বঞ্চিত জনগণ সর্বপ্রথম পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। পরবর্তীতে বিভিন্ন ধাপে বাংলার মানুষের অধিকার আন্দোলন ও সংগ্রাম স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়। এ সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয় এবং বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নেয় বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্র।

➘ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ দলিলের গুরুত্ব

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ দলিলে পাকিস্তান ও ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর করেন যথাক্রমে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লে. জে. এ. এ. কে নিয়াজী এবং ভারতীয় মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বাহিনীর কমান্ডার লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং মুক্তিবাহিনীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি চীফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ দলিলের গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো।

০১. **আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান :** ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বিকেলে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বাংলাদেশে অবস্থিত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক লে. জে. এ. এ. কে. নিয়াজী হাজার হাজার উৎফুল্ল জনতার সামনে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করে। প্রায় ৯৩,০০০ পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করে, যা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সর্ববৃহৎ আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান। ফলে বাংলাদেশের মানুষের বহু আকাঙ্ক্ষিত বিজয় ধরা দেয় যুদ্ধ শুরুর নয় মাস পর।

০২. **পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দম্ভের অবসান :** বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রারম্ভে জেনারেল ইয়াহিয়া খান অহংকার ভরা কণ্ঠে বলেছিলেন এ দেশের মানুষ চাই না, মাটি চাই। কিন্তু নিরস্ত্র বাঙালি জাতি যুদ্ধের ময়দানে পরিণত কৌশল ও বীরত্ব প্রদর্শন করে চূড়ান্তবিজয় লাভ করে। ধুলায় ধুসরিত হয় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দাম্ভিকতা। যেটির জীবন্ত সাক্ষী আত্মসমর্পণ দলিল।

০৩. **বাঙালি জাতির চূড়ান্ত বিজয় :** বাংলার মানুষ দীর্ঘ নয় মাস বিশ্বের বৃহৎ শক্তির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে প্রাণপণ লড়াই করে। লাখ লাখ মানুষ নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে। পঙ্গুত্ব বরণ করেছে অসংখ্য বাঙালি। নিজের সতীত্ব বিসর্জন দিয়েছে লাখ লাখ নারী। অবশেষে বাঙালি জাতির এ ত্যাগের পুরস্কারস্বরূপ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ আত্মসমর্পণ চুক্তির মাধ্যমে স্বাধীনতা বিজয় অর্জিত হয়।

০৪. **পাকিস্তানি শোষণের অবসান :** পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিকভাবে চরম বঞ্চিত ও উপেক্ষিত ছিল। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও বাংলার মানুষ ব্যাপক বঞ্চনার স্বীকার হয়। বাঙালি জাতি পিছিয়ে পড়ে শিক্ষা-দীক্ষায়। সমগ্র বাঙালি জাতি অতিষ্ট হয়ে ওঠে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণে। অবশেষে স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে এ শোষণের অবসান ঘটে।

০৫. **বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয় :** ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বীজ অঙ্কুরিত হয় তা ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন, ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলন এবং ১৯৬৯ এর গণ-আন্দোলনে আরো পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি লাভ করে এবং বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ পূর্ণতা লাভ করে।

০৬. **বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি :** ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাঙালি জাতি অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ করে। বাংলার মানুষ অসীম সাহসিকতা আর বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে দীর্ঘ নয় মাস। অসংখ্য মানুষের ত্যাগ আর জীবনের বিনিময়ে পাকিস্তানি বাহিনী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয় আত্মসমর্পণ দলিল। ফলে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান করে নেয় বাংলাদেশ নামক ছোট্ট একটি রাষ্ট্র।

০৭. **আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি :** স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে বিশ্বের অনেক বৃহৎশক্তি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের বিজয় লাভের পথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। কিন্তু ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ দলিলের মাধ্যমে বাঙালি চূড়ান্ত বিজয় লাভ করলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করতে থাকে।

০৮. **বিশ্বের বুকে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন :** পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের মত এত তাৎপর্যপূর্ণ স্বাধীনতা যুদ্ধ বিরল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান ছিল সর্ববৃহৎ। তৎকালীন বিশ্বের বৃহৎ শক্তির প্রতিকূলে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভ করা দেশের সংখ্যাও বিরল।

পরিশেষে বলা যায়, বাঙালি জাতীয়তাবাদের পূর্ণতা লাভ, বাঙালি জাতির অত্মপ্রত্যয়ের পূর্ণতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্বীকৃতি, বঞ্চনা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মানসিকতা এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ দলিলের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম ও অনস্বীকার্য।

যুদ্ধাপরাধ এবং বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারপ্রক্রিয়া

যুদ্ধারপাধ মানবতা বিরোধী এক জঘন্যতম আন্তর্জাতিক অপরাধ। সাধারণত যুদ্ধের সময় গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, ষড়যন্ত্র, নারী ধর্ষণ প্রভৃতি অপরাধই হচ্ছে যুদ্ধাপরাধ। পৃথিবীর অনেক দেশেই এই ঘৃণ্যতম অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। দেশে দেশে এই অপরাধের বিচারও হয়েছে, এমনি এক ঘৃণ্যতম অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল বাংলাদেশে, ১৯৭১ সালে আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সাড়ে সাত কোটি শান্তি প্রিয় মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাকিস্তানি সৈন্য রূপে হায়েনারা। তাদের গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের ফলে এদেশের ত্রিশ লক্ষ লোক শহীদ হয়েছে, ২ লক্ষ নারী ধর্ষিত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘর বাড়ী ছাড়া হয়েছে। দীর্ঘ ৩৯ বছর পর বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধিদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয় এখনও তা অব্যাহত আছে।

যুদ্ধাপরাধের সংজ্ঞা : যুদ্ধাপরাধ বলতে কোনো দেশ, জাতি, সামরিক বা বেসামরিক ব্যক্তি কর্তৃক যুদ্ধের প্রথা বা আন্তর্জাতিক নীতিমালা লঙ্ঘন করাকে বোঝায়।

হার্ভাড বিশ্ববিদ্যাল প্রেস থেকে প্রকাশিত 'দ্য ব্যাক বুক অফ কমিউনিজম : ক্রাইম, টেরর, রিপ্রেশান' গ্রন্থে যুদ্ধাপরাধের সাংজ্ঞিক অর্থ 'যুদ্ধের আইন বা প্রথাকে লঙ্ঘন করা বলতে- হত্যা, নির্যাতন বা সাধারণ নাগরিকদের নির্যাচিত করে অধিকৃত জনপদে ক্রীতদাস শ্রম ক্যাম্পে পরিণত করা, আটককৃতদের হত্যা ও নির্যাতন, অপহৃতদের হত্যা, সামরিক বা বেসামরিক প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই দায়িত্বজ্ঞানহীন নগর, শহর ও গ্রামাঞ্চলকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করাকে উল্লেখ করা হয়।

Defination of United Nations Human Rights Office

'The terms 'war crimes' refers breaches of international humanitarian law committed againest civilians or enemy combatants during an international or domestic armed conflict, which the perpetrators may be held crimionally liable on an individual basis.''

Defination of International Committee of Red Cross (ICRC)

War Crime is Acts or "ommission committed during an armed conflict, which violate the rules of law as defined by international law. These acts or omission include the ill-treatment of civilians Within occupied territories, the violation and exploitation of individuals and private property and the torture and execution of prosoners''.

Defination by Marko Divac Oberg, International Review of Red Cross. 2009

"War crimes : namely, violations of the laws or customs of war. Such violations shall include, but not be limited to murder ill-treatment or deportation to slave labour or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory murder or ill-treatment of prisoners of war or persons on the seas, killing of hostage, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity."

চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ১৪৭ ধারায় যুদ্ধাপরাধ প্রসঙ্গে বলা হয় : ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা, নির্যাতন বা অমানবিক ব্যবহার এবং কারো শরীর বা স্বাস্থ্যে গুরুতর আঘাত করা বা তার দুর্দশার কারণ তৈরি, অন্যায়ভাবে কাউকে বিতাড়ন বা স্থানান্তর করা বা আটক করা, সশস্ত্রবাহিনীর সেবাদানে বাধ্য করা, যথাযথ ও নিয়মতান্ত্রিক বিচার পাওয়ার অধিকার থেকে কাউকে জিম্মি করা বিপুল পরিমাণে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো ও সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, সামরিক প্রয়োজন না থাকা স্বত্ত্বেও বেআইনি ও নীতিবিরুদ্ধ ওপরের যে কোনো এক বা একাধিক কার্মকাণ্ড যুদ্ধাপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। যুদ্ধাপরাধের ধারণার মর্মমূলে ছিল যে, একটি দেশের বা দেশের সৈন্যদের কাজের জন্য একজন ব্যক্তিও দায়ী হতে পারেন। গণহত্যা, মানবতা বিরুদ্ধে অপরাধ, সাধারণ নাগরিকদের হয়রানি-এসবই যুদ্ধাপরাধের মধ্যে পড়ে। এসবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর হলো গণহত্যা। সুতরাং যুদ্ধাপরাধ হচ্ছে কোনো যুদ্ধ বা সামরিক সংঘাত চলাকালীন সময়ে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে সংগঠিত, সমর্থিত নির্দিষ্ট সংজ্ঞায়িত অপরাধ কর্মকাণ্ড সমূহ।

দেশে দেশে যুদ্ধাপরাধ ও বিচার: যুদ্ধাপরাধ একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ। এটি এখন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের আওতায় চলে এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তি ও মানবতার বিরুদ্ধে যে কোনো অপরাধকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে নানা আঙ্গিকে যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছে। আবার যুদ্ধাপরাধের বিচারে গঠিত হয়েছে বিভিন্ন ট্রাইব্যুনাল ও কোর্ট। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১. **যুদ্ধাপরাধ ও আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের ধারণা :** ১৮৯৯ সালে ফিলিপাইন-আমেরিকান যুদ্ধকালীন সময়ে শান্তিপূর্ণ সমাধানের উদ্দেশ্যে হল্যান্ডে আয়োজিত Hague Peace Conference- 1 এ প্রথমবারের মতো Laws of war এবং War Crime-গুলোকে চিহ্নিত করে তা আন্তর্জাতিক আইন হিসেবে গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। এখানে প্রথমবারের মতো যুদ্ধাপরাধ ও আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের কনসেপ্টের সূচনা হয়েছিল।

২. **উল্লেখ্যযোগ্য ট্রাইব্যুনাল:** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধাপরাধ নিয়ে বিশ্বের ছোট বড় দেশগুলো সোচ্চার হওয়ায় বিভিন্ন ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল, টোকিও ট্রাইব্যুনাল, যুগোস্লাভিয়া ট্রাইব্যুনাল ও রুয়ান্ডা ট্রাইব্যুনাল। এগুলো ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো:

দেশে দেশে যুদ্ধাপরাধ ও বিচার

ট্রাইব্যুনাল	প্রতিষ্ঠা	কার্যক্রম শুরু - শেষ	রায় প্রকাশ	অভিযুক্ত	শাস্তি
ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল	৭ জুলাই ১৯৪৫	১৮ অক্টোবর ১৯৪৫-৩১ আগস্ট ১৯৪৬	১ অক্টোবর ১৯৪৬	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির অভিযুক্ত ২৪ সেনা	মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ১২ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ৩ জন এবং কারাদণ্ড ৪৫ জন
টোকিও ট্রাইব্যুনাল	২০ জুলাই ১৯৪৫	১৯৪৬ সালের জুন মাসে	নভেম্বর ১৯৪৮	জাপানের ২৮ জন যুদ্ধাপরাধী	বিভিন্ন মেয়াদে করাদণ্ড দেয় হয়।
যুগোস্লাভিয়া ট্রাইব্যুনাল	২৫ মে ১৯৯৩ এ গঠিত এবং ১৭ নভেম্বর ১৯৯৩ প্রতিষ্ঠিত	৮ নভেম্বর ১৯৯৪ চলমান	Verdicts will complete in 2015	বসনিয়া সার্ব নেতা ও সামরিক কমান্ডারগণ	Verdicts will complete in 2015
রুয়ান্ডা ট্রাইব্যুনাল	৮ নভেম্বর ১৯৯৪	১৯৯৭	১৯৯৮	রুয়ান্ডা গণহত্যার জড়িত তুতসিরা	রুয়ান্ডার সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান।

৩. **আইসিসি গঠন :** বিভিন্ন দেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ২০০২ সালে নেদারল্যান্ডের দি হেগ শহরে গঠন করা হয় ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট (আইসিসি)। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইসরাইলসহ বেশ কয়েকটি দেশ এ আন্তর্জাতিক আদালতের বিরোধীতা করে এবং এর সাথে যে কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা রাখতে অস্বীকার করে ।

৪. **বিশেষ আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কোর্ট :** যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইনের সমন্বয়ে বিশেষ আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কোর্ট স্থাপিত হয়। যেমন- সিয়েরা লিওনের বিশেষ আদালত, লেবাননের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, পূর্ব তিমুরে দিলি ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, কম্বোডিয়া ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি।

বাংলাদেশে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান গণদাবী। সকল মত, ধর্ম, পেশা, শ্রেণির জনসাধারণ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অনুষ্ঠিত হবার পক্ষে সোচ্চার মুক্তিযুদ্ধের সময় বিরোধীতাকারী গুটিকয়েক মানুষ এবং তাদের কিছু সংখ্যক সমর্থন ছাড়া সমগ্র জাতি প্রকৃত যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার পক্ষে নানা ইস্যুতে দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভিন্ন মত থাকলেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ইস্যুতে প্রায় সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুস্পষ্ট ঐকমত্য প্রতীয়মান।

↘ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পটভূমি

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেই বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রথম জনসসভায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি সরকার "বাংলাদেশ কলাবরেটরস স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল অর্ডার ১৯৭২" প্রণয়ন করে এর আওতায় ৩৭,৪৭১ ব্যক্তিকে আটক করা হয় এবং ৭৫২ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়। ১৯৭৩ সালে ৩০ নভেম্বর আন্তর্জাতিক চাপের মুখে আলোচিতদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। বঙ্গবন্ধু নৃশংসভাবে নিহত হওয়ার পর ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তৎকালীন সরকার এই আইনটি বাতিল করে। কলাবটেরস অ্যাক্ট বা দালাল আইনে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্ভব না হওয়ায় ১৯৭৩ সালের ২০ জুলাই 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইব্যুনালস্) এ্যাক্ট' প্রণয়ন করা হয়।

কিন্তু ১৯৭৪ সালের ১৯ এপ্রিল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতায় ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীকে ছেড়ে দিতে হয় বাংলাদেশকে। তবে এই আইনটি এখনও বলবৎ আছে। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের ১৩ দিনের মাথায় জহির রায়হান গঠন করেছিলেন "বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত কমিশন"। তার নিখোঁজের পর কমিশনের কাজ আর এগোয়নি। তবে বঙ্গবন্ধু কখনোই খুন, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের মতো অপরাধ ক্ষমা করেননি।
যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য ১৯৭২ সালে দালাল আইনে সারা দেশে ৬২টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছিল। সে সময় ১১ হাজার যুদ্ধাপরাধীকে চিহ্নিত করে বিচার কাজ শুরু হয়। এর মধ্যে ৭৫২ জনের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আব্দুল মালেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন ট্রাইব্যুনাল। পঁচাত্তরের ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ট্রাইব্যুনাল বিলুপ্ত করা হয় এবং আটক অপরাধীদের ছেড়ে দেয়া হয়। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সেক্টর কমাণ্ডারস ফোরাম, এর আগে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এবং বর্তমান মহাজোটের শরিক বাম দলগুলোর পক্ষ থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করা হয়। নব্বইয়ের দশকে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে সারা দেশে যুদ্ধপরাধের বিচারের দাবিতে গণ আন্দোলন গড়ে ওঠে। তখন গণতন্ত্র কমিশন করে বেশ কয়েকজন প্রতীকী মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

↘ জাতীয় ঐক্য এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে দেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার জন্য ২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠর করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্য শুরু করা হয়। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে অভিযোগ প্রমাণ করে রায় ঘোষণা করা হয়েছে। আরো অনেকের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাংলাদেশে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এগুলো হলোঃ

১. **রাজনৈতিক ঐক্য :** বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাংলাদেশে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শে অনেক রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়েছে। রাজনৈতিক আদর্শ এবং মতের ভিন্নতা থাকলেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সমস্ত রাজনৈতিক দলকে এর পক্ষে একটি প্লাটফর্মে একত্রিত করতে পেরেছে।

২. **সামাজিক ঐক্য :** বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক শ্রেণি বিভাগের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ছাত্র, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শ্রমিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিসহ অন্যান্য শ্রেণি পেশার মানুষও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়ে একমত।

৩. **মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে ঐক্য :** বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ মনে করে মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁদের বহু ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। তাই যারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে নিরীহ সাধারণ মানুষ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নির্বিচারে হত্যাসহ নির্যাতন করেছে তাদের যথাযোগ্য শাস্তি প্রদান করা না হলে প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন নিশ্চিত করা যাবে না। সমগ্র জাতি মুক্তিযোদ্ধাদের উপযুক্ত সম্মান নিশ্চিত করার জন্যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

৪. **আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জাতীয় মর্যাদা সমুন্নত রাখার ঐক্য :** স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সম্মান ও মার্যাদা অক্ষুন্ন রাখার জন্যে দেশের জনগণ যথেষ্ট সচতন। যুদ্ধাপরাধীদের মত ঘৃণ্য অপরাধীদের জন্য উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে না পারলে বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে। তাই দেশের জনগণ যুদ্ধপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সুনাম ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার জন্য একত্রিত হয়েছে।

৫. **নতুন প্রজন্মকে ঐক্যবদ্ধ করা :** বাংলাদেশের যে প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি তাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। নতুন প্রজন্ম মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযোগ্য সম্মান নিশ্চিত করার জন্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে রাষ্ট্রের কল্যাণে নিজেদের ভূমিকা রাখার জন্যে উদ্বুদ্ধ করছে। নতুন প্রজন্ম যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর পক্ষে নিজেদের সুদৃঢ় অবস্থানকে সুস্পষ্টভাবে জাতির সামনে তুলে ধরেছে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে মুক্তির জন্য জাতীয় ঐক্যের বিকল্প নেই। দ্বিধা বিভক্ত জাতি কখনোই অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে না। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং অস্তিত্বেই প্রশ্নে একমাত্র জাতীয় ঐক্যই পারে জাতীয় স্বার্থ নিশ্চিত করতে। তাই বলা যায়, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

➘ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচার কার্যক্রম

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে দুটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। নিচে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

i. **ট্রাইব্যুনাল- ১ :** আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) অ্যাক্ট ১৯৭৩-এর ১৯-এর ৯ নং সেকশনের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২০১০ সালের ২৫ মার্চ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল- ১ গঠন করা হয়। তখন এর চেয়ারম্যান হিসেবে ছিলেন বিচারপতি নিজামুল হক। কিন্তু স্কাইপ সংলাপের জের ধরে বিচারপতি নিজামুল হক ১১ ডিসেম্বর ২০১২ পদত্যাগ করলে ১৩ ডিসেম্বচর ২০১২ ট্রাইব্যুনালের পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হন বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির এবং সদস্য হন বিচারপতি আনোয়ারুল হক ও বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন।

ii. **ট্রাইব্যুনাল- ২ :** বিচারপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল- ২ গঠন করা হয় ২২ মার্চ ২০১২। পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনাল অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান হন বিচারপতি ওবায়দুল হাসান এবং সদস্য বিচারপতি মো. শাহিনুর ইসলাম ও বিচারপতি মজিবুর রহমান মিয়া। পরবর্তীতে মামলার সংখ্যা কমে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে ট্রাইব্যুনাল দুটিকে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ একীভূত করা হয়। যার ফলে প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বর্তমানে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল- ১ এর সদস্য বিচারপতি এম এনায়েতুর রহিমকে এর চেয়ারম্যান করা হয়। ট্রাইব্যুনালের অপর তিন সদস্য হলেন- বিচারপতি আমির হোসেন, বিচারপতি মোহাম্মদ সোহরাওয়ার্দী এবং বিচারপতি আবু আহমেদ জমাদার।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে এ পর্যন্ত ৩৬টি মামলায় ৯২ জনের বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় এবং তাদরেকে মৃত্যুদণ্ডসহ বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়। এর মধ্যে বর্তমানে ২৬টি মামলা সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে বিচারাধীন রয়েছে এবং ১০জনের মামলা আপিল বিভাগে রায়ের অপেক্ষায় রয়েছে।

➘ এ পর্যন্ত ৮ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের সাজা সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো-

সাজাপ্রাপ্ত	সমন্বিত ট্রাইব্যুনালের রায়	ট্রাইব্যুনাল- ১ এর রায়	ট্রাইব্যুনাল-২ এর রায়	আপিলের রায়	রিভিউ নিষ্পত্তি	ফলাফল
০১. আবুল কালাম আযাদ			৪ টিতে মৃত্যুদণ্ড, ৩ টিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড			
০২. আব্দুল কাদের মোল্লা			৩ টিতে ১৫ বছরের কারাদণ্ড, ২ টিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড	মৃত্যুদণ্ড	মৃত্যুদণ্ড	মৃত্যুদণ্ড কার্যকর
০৩. দেলোয়ার হোসেন সাঈদী		মৃত্যুদণ্ড		আমৃত্যু কারাদণ্ড		
০৪. মুহম্মদ কামারুজ্জামান			মৃত্যুদণ্ড	মৃত্যুদণ্ড	মৃত্যুদণ্ড	মৃত্যুদণ্ড কার্যকর
০৫. গোলাম আযম		৯০ বছর		আমৃত্যু		কারাগারে

সাজাপ্রাপ্ত	সমন্বিত ট্রাইব্যুনালের রায়	ট্রাইব্যুনাল- ১ এর রায়	ট্রাইব্যুনাল-২ এর রায়	আপিলের রায়	রিভিউ নিষ্পত্তি	ফলাফল
		নিরবিচ্ছিন্ন কারাদণ্ড		কারাদণ্ড		মৃত্যুবরণ
০৬. আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ			মৃত্যুদণ্ড	মৃত্যুদণ্ড	মৃত্যুদণ্ড	মৃত্যুদণ্ড কার্যকর
০৭. সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী		মৃত্যুদণ্ড		মৃত্যুদণ্ড	মৃত্যুদণ্ড	মৃত্যুদণ্ড কার্যকর
০৮. আব্দুল আলীম			আমৃত্যু কারাদণ্ড			কারাগারে মৃত্যুবরণ
০৯. আশরাফুজ্জামান			মৃত্যুদণ্ড			
১০. চৌধুরী মুঈনুদ্দীন			মৃত্যুদণ্ড	মৃত্যুদণ্ড		
১১. মতিউর রহমান নিজামী		মৃত্যুদণ্ড		মৃত্যুদণ্ড		মৃত্যুদণ্ড কার্যকর
১২. মীর কাসেম আলী			মৃত্যুদণ্ড	মৃত্যুদণ্ড		মৃত্যুদণ্ড কার্যকর
১৩. এম. এ. জাহিদ হোসেন খোকন		মৃত্যুদণ্ড		বিচারাধীন		
১৪. কমান্ডার মো. মোবারক হোসেন		মৃত্যুদণ্ড		বিচারাধীন		
১৫. সৈয়দ মো. কায়সার			মৃত্যুদণ্ড	মৃত্যুদণ্ড		মৃত্যুদণ্ড কার্যকর
১৬. আজহারুল ইসলাম		মৃত্যুদণ্ড		বিচারাধীন		
১৭. মুহাম্মদ আব্দুস সোবহান			মৃত্যুদণ্ড	বিচারাধীন		
১৮. আব্দুল জব্বার		আমৃত্যু কারাদণ্ড		বিচারাধীন		
১৯. মাহিদুর রহমান			আমৃত্যু কারাদণ্ড	বিচারাধীন		
২০. আফসার রহমান			আমৃত্যু কারাদণ্ড	বিচারাধীন		
২১. সৈয়দ মো. হাসান আলী		মৃত্যুদণ্ড		বিচারাধীন		
২২. ফোরকান মল্লিক			মৃত্যুদণ্ড	বিচারাধীন		
২৩. শেখ সিরাজুল হক ওরফে সিরাজ মাস্টার		মৃত্যুদণ্ড		বিচারাধীন		
২৪. খান মোহাম্মদ আকরাম হোসেন		আমৃত্যু কারাদণ্ড		বিচারাধীন		
২৫. ওবায়দুল হক	মৃত্যুদণ্ড			বিচারাধীন		
২৬. আতাউর রহমান	মৃত্যুদণ্ড			বিচারাধীন		

মুক্তিযুদ্ধ ও জাতিসংঘ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা দক্ষিণ এশিয়ার সাম্প্রতিক ইতিহাসে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। কারণ একটি আঞ্চলিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্যা ক্রমশ মুক্তিসংগ্রামে রূপান্তরিত হয় এবং এক পর্যায়ে আঞ্চলিকতা ছাড়িয়ে তা আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল পাক শাসকদের শোষণ, বঞ্চনা, হত্যা, নিপীড়ন, নির্যাতন ইত্যাদির বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার (প্রায় ৫৬ ভাগ) স্বাধীনতার সংগ্রাম। সুতরাং যে সংগ্রামের প্রতি পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার সমর্থন সে সংগ্রামের প্রতি জাতিসংঘের ভূমিকা হবে গুরুত্বপূর্ণ এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জাতিসংঘ এমন একটি বিশ্ব সংস্থা যেখানে প্রধানত বৃহৎ শক্তিবর্গের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়। অর্থাৎ কোন একটি বিশেষ ইস্যুতে বৃহৎ শক্তিবর্গের দৃষ্টিভঙ্গী কি বা ঐ ইস্যুকে তারা কিভাবে গ্রহণ করেছে মূলত তার ওপর ভিত্তি করেই জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বৃহৎ শক্তিবর্গের ঐকমত্য ব্যতীত জাতিসংঘ কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

↘ জাতিসংঘের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা বা কার্যক্রমকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

ক. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মানবিক কার্যক্রম সংক্রান্ত তৎপরতা;

খ. যুদ্ধ বন্ধ ও রাজনৈতিক সমাধান প্রশ্নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ;

গ. মুজিবনগর সরকার ও জাতিসংঘ;

ঘ. শেখ মুজিবের বিচার প্রশ্ন ও জাতিসংঘ;

ঙ. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান প্রশ্ন ও জাতিসংঘ।

ক. মানবিক কার্যক্রম সংক্রান্ত তৎপরতা

মানবিক কার্যক্রম সংক্রান্ত ভূমিকায় জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে শরণার্থীদের ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্ব হতেই শরণার্থী সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে এবং দ্রুত এটি দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংকট হতে একটি আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত হয়। বিভিন্ন পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বাধীনতার প্রশ্নে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এত বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী আর কখনো বাস্তুচ্যুত হয়নি। জাতিগত নিপীড়ন, হিন্দু বিদ্বেষ ও গণহত্যার কারণে বিশেষ করে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ মধ্যরাতে যে বাঙালি নিধনযজ্ঞ শুরু হয় তারপর হতে প্রাণভয়ে ও নিরাপত্তার সন্ধানে লক্ষ লক্ষ মানুষ পার্শ্ববর্তী ভারতের সীমান্তবর্তী গ্রাম ও শহরগুলোতে আশ্রয় নেয়। ডিসেম্বর নাগাদ শরণার্থীদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১ কোটি। এই বিপুল পরিমাণ শরণার্থীর খাদ্য, পানীয়, ঔষধপত্র, মাথাগোঁজার ঠাই ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা এক জটিল অবস্থা সৃষ্টি করে। আর এই জটিল অবস্থা মোকাবেলায় অর্থাৎ শরণার্থী সমস্যা ও মানবিক বিষয়ে জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতিসংঘের ভাষায়; The organization (UN) mounted largest humanitarian operation in its history during and after in conflict over Bangladesh.

১৯৭১ সালে জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার (টঘঐঈজ) প্রধান প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান শরণার্থী সমস্যাকে জাতিসংঘের জন্য এক মানবিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে অভিহিত করেন। যাহোক, মানবিক সমস্যা মোকাবেলায় উপমহাদেশে জাতিসংঘের দুটো মিশন কাজ করে। এর একটি পরিচালিত হয় ভারতে, অপরটি দখলীকৃত বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তানে)।

শরণার্থী সমস্যায় মানবিক সাহায্য প্রদানে সহায়তার জন্য জাতিসংঘ সরাসরি প্রস্তাব প্রদান করে ১৯৭১ সালের ১ এপ্রিল। কিন্তু জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আগাশাহী সরাসরি এর বিরোধিতা করেন। তবে পাকিস্তানের বিরোধিতা সত্ত্বেও জাতিসংঘ মহাসচিব উ-থান্ট ২২ এপ্রিল দ্বিতীয়বারের মত মানবিক সাহায্য প্রদানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে পত্র দেন। এ পত্রে মহাসচিব পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ইয়াহিয়াকে তিনি জানান যে, ২৫ মার্চের 'ক্র্যাকডাউন'এর পর ঢাকা থেকে জাতিসংঘের যে সকল কর্মকর্তা ফেরৎ এসেছেন তাদের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে তিনি পরিস্থিতির নেতিবাচক প্রবণতা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। এছাড়াও জাতিসংঘের কাঠামোতে মানবাধিকারের যে নীতিমালা রয়েছে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টির ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। ইয়াহিয়াকে তিনি জানান যে, পাকিস্তানের সম্মতি পেলে জাতিসংঘ এবং তার বিশেষায়িত সংস্থাগুলো একটি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি আরও জানান যে, সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যে দুর্গতি ও মানবিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে তার সহায়তায় জাতিসংঘ ভূমিকা রাখতে পারে।

খ. যুদ্ধ বন্ধ ও রাজনৈতিক সমাধান প্রশ্নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ

শরণার্থী সমস্যা ক্রমশ একটি আন্তর্জাতিক সংকটের পটভূমি সৃষ্টি করে। ফলে ভরণ-পোষণের মতো মানবিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি রাজনৈতিক সমাধানের বিষয় নিয়ে বিভিন্ন মহলে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। তবে বাংলাদেশ সংকটকে বৃহৎ শক্তিগুলো স্বীয় জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করার জন্য প্রকাশ্য এবং গোপন কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। একই সমান্তরালে জাতিসংঘ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ ও কিছু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জাতিসংঘ মহাসচিবের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সদস্য দেশসমূহের প্রতিক্রিয়া।

১. **জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাব:** জাতিসংঘ মহাসচিব ১৯৭১ সালের ১৯ জুলাই জাতিসংঘে ভারত ও পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধিদ্বয়ের কাছে প্রস্তাব করেন যে, সীমান্তের দুই প্রান্তে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন তদারকি করার জন্য টঘঐঈজ-এর প্রতিনিধি বা পর্যবেক্ষক মোতায়েন করা প্রয়োজন। পাকিস্তান সরকার আনন্দের সাথে এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু ভারত ও মুজিবনগর সরকার প্রস্তাবটি দৃঢ়ভাবে বাতিল করে দেয়। উল্লেখ্য প্রথমদিকে ভারত চেয়েছিল যে, পূর্ববাংলায় গণহত্যা বন্ধ ও সেখান থেকে আসা শরণার্থীদের সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করুক। অন্যদিকে প্রথমে পাকিস্তান শরণার্থী প্রশ্নে জাতিসংঘের জড়িত হওয়ার বিষয়টিকে মেনে নিতে চায়নি এবং এ ধরনের যে কোন উদ্যোগকে পাকিস্তান তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের সামিল বলে বিবেচনা করে। কিন্তু মে মাস থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শে ইয়াহিয়া খান জাতিসংঘের যাবতীয় উদ্যোগ মেনে নিতে সম্মত হয় ও কূটনৈতিক তৎপরতায় সক্রিয় হয়ে ওঠে যাতে জাতিসংঘের চাপে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় এবং জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় তাদের প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়। কিন্তু ভারত বিষয়টি অনুধাবন করে জাতিসংঘের মানবিক উদ্যোগের ছদ্মাবরণে রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণের তীব্র বিরোধিতা করতে থাকে। কারণ জাতিসংঘ মহাসচিব গণহত্যা বন্ধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে একেবারেই নীরব ছিল। স্পষ্টতই পর্যবেক্ষক মোতায়েনের উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত, বাংলাদেশের চার পাশ ঘিরে রেখে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধাভিযান প্রতিরোধ করা এবং দ্বিতীয়ত, মুক্তিবাহিনীর পক্ষে ভারতীয় সহায়তার পথ বন্ধ করা। যাহোক, মুজিবনগর সরকার ও ভারতের প্রত্যাখ্যানের পর জাতিসংঘ কর্মকর্তারা শরণার্থী সংস্থার পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাবটি বাতিল করে দেয়।

২. **নিরাপত্তা পরিষদ বরাবর জাতিসংঘ মহাসচিবের স্মারকপত্র প্রদান:** পাক-ভারত সীমান্তে পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাবের একদিন পর ২০ জুলাই ১৯৭১ জাতিসংঘ মহাসচিব ৯৯ ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি ও সদস্য রাষ্ট্রসমূহের বরাবরে একটি স্মারকপত্র প্রদান করেন। মহাসচিবের এই স্মারকপত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি মূল ইস্যুগুলো এড়িয়ে গেছেন এবং তাঁর এ উদ্যোগের লক্ষ ছিল পাকিস্তানকে কিছুটা সহায়তা করা। কারণ বাংলাদেশ সংকটকে তিনি ভারত ও পাকিস্তানের পূর্ববর্তী শত্রুতার জের হিসেবে উল্লেখ করেছেন– যা প্রকৃতপক্ষে সত্য নয় এবং ভারত ও পাকিস্তানকে তিনি বিবদমান পক্ষ হিসেবে দেখিয়েছেন, কিন্তু বাংলাদেশ যে একটি পক্ষ তা তিনি উল্লেখ করেননি। তাছাড়া ১৯৭১ সালের পূর্ববর্তী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বনাম রাষ্ট্রীয় অখন্ডতার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত হয়েছিল তার উল্লেখ করে বাংলাদেশ সংকটকেও তিনি আবেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করেছেন এমনকি পাকবাহিনী কর্তৃক বাঙালির গণহত্যার বিষয়টি তিনি উল্লেখই করেন নি।

৩. **জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ:** ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হয় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৬তম বার্ষিক অধিবেশন। জাতিসংঘের এ অধিবেশনে এজেন্ডাভুক্ত বিষয় হিসেবে 'বাংলাদেশ সংকট' সরাসরি স্থান পায়নি। তবে মহাসচিবের বার্ষিক প্রতিবেদন ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের বক্তব্যে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ এসেছে। মহাসচিব কর্তৃক বাংলাদেশ শব্দটির উল্লেখ না করা এবং স্বয়ং সাধারণ পরিষদের সভাপতির বাংলাদেশ সংকটকে উপেক্ষা করা সত্ত্বেও ৫৭টি দেশ তাদের বক্তব্যে বাংলাদেশ প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে। এর মধ্যে ২৪টি দেশ সমস্যার মানবিক দিক এবং ৩৩টি দেশ মানবিক বিষয়ের সাথে সমস্যার রাজনৈতিক দিকটি চিহ্নিত করে। অধিবেশনের সভাপতি ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী আদম মালিক বাংলাদেশ প্রশ্নে সাধারণ পরিষদে বিতর্কের পক্ষে ছিলেন না। তিনি সমস্যাটিকে মূলত ভারত-পাকিস্তানের মধ্যেকার দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছাতে উভয় দেশের ওপর প্রভাব বিস্তারের কথা উল্লেখ করেন। অবশ্য অধিবেশন শুরুর দু'দিন আগে জাতিসংঘ মহাসচিব উ-থান্ট তাঁর বার্ষিক রিপোর্টে মন্তব্য করেন যে, যদিও 'গৃহযুদ্ধের' বিষয়টি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় তবে এ বিষয় থেকে যে সকল সমস্যার জন্ম হয়েছে তা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই উদ্বেগের কারণ এবং রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের অগ্রগতি খুবই কম। যাহোক, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ সংকট আলোচিত হওয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের যে শতাধিক সদস্য রাষ্ট্র অধিবেশনে যোগদান করে তারা বাংলাদেশের সমস্যা সম্পর্কে অবগত হয়।

৪. **জাতিসংঘ মহাসচিবের Good Office প্রস্তাব:** বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যখন একটি চূড়ান্ত পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল ঠিক সে সময় জাতিসংঘ মহাসচিব সংকট নিরসনে আরেকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ২০ অক্টোবর ভারত ও পাকিস্তান সরকারের কাছে এক পত্রে তিনি তাঁর Good Office ব্যবহারের প্রস্তাব দেন। মহাসচিবের এই পত্রটির অন্তর্নিহিত অর্থ হলো সমগ্র বিষয়টিকে তিনি ভারত- পাকিস্তান সংঘাত হিসেবে বিবেচনা করেন। পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও সমস্যাটিকে পাক-ভারত সংঘর্ষে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং দেখা যায় যে, ইয়াহিয়া ও জাতিসংঘ মহাসচিব দু'জনই সমস্যাটিকে দেখেছেন পাকভারত সমস্যা হিসেবে। কারণ তাহলে বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম অমীমাংসিত থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই মহাসচিবের প্রস্তাবের একদিন পরই পাকিস্তান প্রস্তাবটিতে সম্মতি জানায়। কিন্তু ভারত কিছুটা সময় নিয়ে ১৬ নভেম্বর কৌশলে মহাসচিবকে জানায় যে, ভারত-পাকিস্তানের পরিবর্তে তাঁর উচিত ইয়াহিয়া খান ও আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান করা। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এ বার্তায় মহাসচিবের বিরুদ্ধে মূল সমস্যা পাশ কাটিয়ে কৌশলে পাকিস্তান সামরিক জান্তাকে রক্ষা করতে চাওয়ায় একটি প্রচ্ছন্ন অভিযোগ উচ্চারিত হয়। জাতিসংঘ মহাসচিব এতে বিব্রতবোধ করেন এবং ২২ নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে প্রেরিত বার্তায় অভিযোগ অস্বীকার করেন। উপমহাদেশে ভূমিকা পালনের জন্য জাতিসংঘের আরও একটি উদ্যোগের এভাবেই সমাপ্তি ঘটে। সুতরাং দেখা যায় যে, ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি হতে জাতিসংঘ মহাসচিব দু'সীমান্তে পর্যবেক্ষক নিয়োগ, Good Office ব্যবহারের প্রস্তাব ইত্যাদি যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেন তা আপাতদৃষ্টিতে সাধু উদ্যোগ মনে হলেও এসব ছিল যুক্তরাষ্ট্র বিশেষত নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটির চিন্তাধারার পরিপূরক। যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মুসলিম দেশগুলো সে সময় এ ধরনের উদ্যোগ আশা করত।

গ. মুজিবনগর সরকার ও জাতিসংঘ

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে মুজিবনগর সরকার ও জাতিসংঘের মধ্যেসরাসরি কোন সম্পর্ক ছিল না। তবে পরোক্ষ সম্পর্ক ছিল প্রথম থেকেই এবং মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে তা আরও বিস্তৃত হয়। ১৯৭১ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় জাতিসংঘের ত্রাণ কার্যক্রমের মূল লক্ষ ছিল মুজিবনগরের অসহায় মানুষ। অর্থাৎ মুজিবনগরের অসহায় মানুষের সাথে এ বিশ্ব প্রতিষ্ঠানটির একটি গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তবে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি দলের সাথে জাতিসংঘের সরাসরি পত্র যোগাযোগ হয় আগস্ট মাসে। পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে শেখ মুজিবের বিচারে উদ্যোগী হলে জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিবের অফিসের ডিরেক্টর ব্রায়ান ই. উরকুহার্ট বরাবর ১৮ আগস্ট প্রেরিত এক পত্রে মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে জনাব মওদুদ আহমেদ ঐ মামলায় শেখ মুজিবের আইনজীবী হবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। জবাবে ২৭ আগস্ট ব্রায়ান জানান যে, আইনগত জটিলতার কারণে মওদুদকে মুজিবের আইনজীবী হিসেবে নিযুক্ত করতে মহাসচিব তার Good Office ব্যবহার করতে পারছেন না।

সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে মুজিবের বিচার শুরু হলে মওদুদ আহমেদ ব্রায়ানের বরাবর একটি চিঠি লিখে জানান যে, জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী মহাসচিবের পাকিস্তানের বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু মহাসচিব যদি তাঁর Good Office ব্যবহার করে শেখ মুজিবের সাথে যোগাযোগ করেন, তাহলে মুজিব নিশ্চয়ই তাঁর আইনজীবী হিসেবে মওদুদকেই পেতে চাইবেন। তবে এ যোগাযোগ বেশীদূর অগ্রসর হয়নি।

সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রতিনিধি দল জাতিসংঘ ভবনে বাংলাদেশের মানুষের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের পক্ষে জোরালো প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়। ৪ ডিসেম্বর যুদ্ধ বন্ধ ও বিশ্বশান্তি প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠক শুরু হলে প্রতিনিধি দলের নেতা বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির নিকট একটি পত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক বাস্তবতা তুলে ধরেন এবং মুজিবনগর সরকারের পক্ষে বক্তব্য রাখার আবেদন জানান। তবে বাংলাদেশ যেহেতু তখন স্বাধীন দেশ কিংবা জাতিসংঘের সদস্য ছিল না তাই বাংলাদেশ প্রেরিত প্রতিনিধি দল কোন সরকারি প্রতিনিধি দল ছিল না। এজন্য জাতিসংঘ ভবনে তাদের প্রবেশ করা ছিল বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এক্ষেত্রে তারা জাতিসংঘ সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ড. যোগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সহায়তায় জাতিসংঘ ভবনে প্রবেশ করতেন। প্রবেশ পত্রে শুধু তারিখ থাকত। কোন জায়গা বা সময়ের উল্লেখ না থাকায় ইচ্ছামত যে কোন স্থানে ঢুকে তারা তদ্বির করতে পারতেন। শুধু তাই নয়, ড. ব্যানার্জীর সহায়তায় জাতিসংঘ প্রেস উইং-এ অবস্থিত টেলিগ্রাফ অফিস হতে সহজ ও সুলভ মূল্যে জনাব চৌধুরী মুজিবনগর সরকারের নিকট ঘন ঘন তারবার্তা পাঠিয়ে সাবলিল সংযোগ স্থাপন করেছিলেন।

৪ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি দলের নেতা আবু সাঈদ চৌধুরীকে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দান প্রশ্নে ব্যাপক বিতর্কের পর তাঁকে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেয়া না হলেও তাঁর বক্তব্য সম্বলিত পত্রটি নিরাপত্তা পরিষদের অফিসিয়াল ডকুমেন্ট হিসেবে গ্রহণ ও বিলি করা হয়। অর্থাৎ এটি ছিল এক ধরনের পরোক্ষ স্বীকৃতি।এই প্রথম জাতিসংঘে বাংলাদেশের মানুষের বক্তব্য বাংলাদেশের প্রতিনিধির মাধ্যমে সরাসরি উচ্চারিত হয়। এ বিবেচনায় মুজিবনগর সরকারের জন্য জাতিসংঘ ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্ট।

ঘ. শেখ মুজিবের বিচার প্রশ্ন ও জাতিসংঘ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচার প্রশ্নে জাতিসংঘের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ অবস্থায় ১০ আগস্ট জাতিসংঘ মহাসচিব শেখ মুজিবের বিচার প্রশ্নে পাক সামরিক সরকারের উদ্যোগে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি স্পষ্টভাবে উদ্বেগের সাথে উল্লেখ করেন যে, শেখ মুজিবের বিচারের বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। তিনি বিষয়টিকে শুধু পাকিস্তানের বিচার ব্যবস্থার এখতিয়ারাধীন বিষয় হিসেবে না ভেবে বরং এর রাজনৈতিক গুরুত্ব সহ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে একে একটি ব্যতিক্রমী বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেন। International Commission of Jurist আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিকট প্রেরিত এক টেলিগ্রামে গোপন বিচারের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন। ২৭ আগস্ট মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি মওদুদ আহমদের নিকট এক পত্রে জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিবের অফিস-এর ডিরেক্টর ব্রায়ান জানান যে, জাতিসংঘ মহাসচিব তাঁর এখতিয়ারের মধ্যে শেখ মুজিবের নিরাপত্তার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করছেন এবং পরিস্থিতির যাতে অবনতি না ঘটে সে চেষ্টা করছেন। শেখ মুজিবের 'প্রহসনমূলক' বিচার বন্ধে জাতিসংঘ মহাসচিবের উদ্বেগ ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার মুখে শেখ মুজিবের প্রাণ রক্ষা পায়। তবে উল্লেখ্য যে, এতদিন যাবৎ জাতিসংঘ মহাসচিবের ভূমিকায় পাকিস্তান সন্তুষ্ট থাকলেও সমকালীন বিশ্বের যশস্বী নেতা শেখ মুজিবের বিচার প্রশ্নে উ-থান্টের সাবধানবাণী তাদেরকে 'ক্ষিপ্ত' করে তোলে। তাই ১৫ আগস্ট পাকিস্তান সরকার জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতকে মহাসচিবের এই বিবৃতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানোর নির্দেশ দেন। তদুপরি একথা বলা যায় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণপুরুষ শেখ মুজিবের বিচার প্রশ্নে জাতিসংঘ মহাসচিবের উদ্বেগপূর্ণ বিবৃতি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছিল।

ঙ. বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান প্রশ্ন ও জাতিসংঘ

মুক্তিযুদ্ধকালীন নয় মাস মুজিবনগর সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত ও রাষ্ট্রসমূহের স্বীকৃতি আদায়।এ জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজধানী হতে শুরু করে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ ভবনে পর্যন্ত মুজিবনগর সরকার তৎপর থাকে। আন্তর্জাতিক সমাজে যখন একটি নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে তখনই প্রশ্ন ওঠে স্বীকৃতির। তবে স্বীকৃতি কেবল একটি আইনগত বিষয় নয় বরং এর সাথে রাজনৈতিক প্রশ্ন প্রবলভাবে জড়িয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক আইনের অধিকাংশ সমকালীন লেখক মনে করেন যে, চূড়ান্ত স্বীকৃতি তখনই দেয়া যায় যখন কোন রাষ্ট্র, রাষ্ট্র গঠনের সকল শর্ত পূরণ করে অর্থাৎ ভূ-খন্ড, জনবল, সরকার ও সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি থাকলে একটি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়া যায়।

মুজিবনগর সরকার সব সময়ই হিলি, রৌমারী সহ কিছু কিছু এলাকা শাসন করে এবং বড় শহর ও ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া যুদ্ধরত বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ ভূমি মুজিবনগর সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এ সরকারের ছিল একটি নিজস্ব সেনাবাহিনী, ছিল বিদেশে কূটনৈতিক মিশন, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে একটি প্রচার যন্ত্র এবং একটি রাষ্ট্রীয় কোষাগার যেখান থেকে কর্মচারীদের বেতন দেয়া হতো। এছাড়াও মুজিবনগর সরকার ছিল একটি সর্বদলীয় সরকার। সুতরাং এ সরকার ছিল একটি কার্যকরী সরকার। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতিসংঘ মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকার ও রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়নি। তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চার বছর পর ১৯৭৪ সালে আরব লীগ সর্বপ্রথম ফিলিস্তিন জনগণের ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধি হিসেবে পিএলও (Palestine Liberation Organisation)-কে স্বীকৃতি দেয় এবং পরবর্তীকালে জাতিসংঘও পিএলও-কে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭৬ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ SWAPO-কে (SouthWest African Peoples Organisation) নামিবিয়ার জনগণের একমাত্র ও বৈধ কর্তৃপক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।এ ধরনের স্বীকৃতি প্রাপ্ত দেশগুলো জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে পর্যবেক্ষক বা অংশগ্রহণকারীর মর্যাদা লাভ করে।

SWAPO, PLO ও মুজিবনগর সরকারের প্রকৃতি এক হলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে 'জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের নিয়ম প্রবর্তিত না হওয়ায় জাতিসংঘ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। তবে ৪ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠক শুরু হলে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি আবু সাঈদ চৌধুরীর বক্তব্য সম্বলিত একটি পত্র নিরাপত্তা পরিষদ অফিসিয়াল ডকুমেন্ট হিসেবে গ্রহণ ও বিলি করে যা ছিল বাংলাদেশকে পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি দান। এছাড়া ২১ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে যে প্রস্তাব পাশ হয় সেখানে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে জেনেভা কনভেনশন মেনে চলার আহবান জানানো হয়। অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদ প্রথমবারের মত বাংলাদেশকে একটি পক্ষ হিসেব স্বীকৃতি দেয়।

মুজিবনগর সরকার বলতে কী বোঝেন?

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তথা মাঠে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সব চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে মুজিবনগর সরকার। এ সরকারে স্বাভাবিক সরকারের ন্যায় কতগুলো মন্ত্রণালয় নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়েছিল। দাপ্তরিক কাজও ছিল সুনির্দিষ্ট।

গঠন : ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ভয়াল অপারেশন সার্চ লাইট শুরু হওয়ার পর বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়তা বোধ করে একটি সরকারের। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মন্ত্রিসভা গঠন করা হয় ও ১৭ই এপ্রিল এ মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন।

মুজিবনগর সরকার :

সরকার গঠন	১০ এপ্রিল
শপথ	১৭ এপ্রিল
স্থান	মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথ তলার ভবের পাড়া গ্রাম
সদস্য	৬ জন

মুজিব নগর সরকারের দপ্তর বণ্টন করা হয় ৬ জন ব্যক্তির নামে। এ ছাড়াও এ সরকারের মুখ্য সচিব, ক্যাবিনেট ও সচিবও ছিলেন। এ সরকার নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে কেবল মুক্তিযুদ্ধকে তরাণ্বিত করে যেতো।

দফতর বণ্টন :

ব্যক্তি	দফতর
শেখ মুজিবুর রহমান	রাষ্ট্রপতি
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	উপ রাষ্ট্রপতি, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি
তাজউদ্দিন আহমেদ	প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংস্থাপন
খন্দকার মুসতাক	পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক
এম মনসুর আলী	অর্থ সম্পর্কিত
এ. এইচ. এম কামারুজ্জামান	স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, কৃষি

অন্যান্য :

০১. ইউসুফ আলী - শপথ পাঠ করান
০২. এইচটি ইমাম - মন্ত্রীপরিষদ সচিব
০৩. রুহুল কুদ্দুস - মুখ্য সচিব
০৪. আকবর আলী খান - উপসচিব
০৫. সেনাবাহিনী প্রধান - এম. এ. জি. ওসমানী

বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয় স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করে সারাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধ পরিচালনায় অংশ নেয়।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস - আলোচনা করুন।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে রক্তস্নাত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন। আর এই দিনটিই অর্থাৎ ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। স্বাধীন বাংলাদেশে মহান এই নেতার প্রত্যাবর্তনে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয় পূর্ণতা পায়। স্বয়ং বঙ্গবন্ধু তার এই স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে "অন্ধকার হতে আলোর পথে যাত্রা" হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদাররা বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ধানমন্ডির বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। তাঁকে পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি করা হয়। বাঙালি যখন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে, বঙ্গবন্ধু তখন পাকিস্তানের কারাগারে প্রহসনের বিচারে ফাঁসির আসামি হিসেবে মৃত্যুর প্রহর গুনছিলেন। একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালিদের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হওয়ার পর বিশ্বনেতারা বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। আন্তর্জাতিক চাপে পরাজিত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত বন্দিদশা থেকে বঙ্গবন্ধুকে সসম্মানে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি ২৯০ দিন পাকিস্তানের কারাগারে মৃত্যুযন্ত্রণা শেষে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান থেকে ছাড়া পান। এদিন তাঁকে ও ড. কামাল হোসেনকে বিমানে তুলে দেওয়া হয়। সকাল সাড়ে ৬ টায় তাঁরা পৌঁছান লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে। সকাল ১০টার পর থেকে তিনি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ, তাজউদ্দিন আহমদ ও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীসহ অনেকের সঙ্গে কথা বলেন। পরে ব্রিটেনের বিমানবাহিনীর একটি বিমানে তিনি পরের দিন ৯ জানুয়ারি দেশের পথে যাত্রা করেন। লন্ডন থেকে ঢাকা আসার পথে বঙ্গবন্ধু নয়াদিল্লিতে অবতরণ করেন। ১০ তারিখ সকালেই তিনি নামেন দিল্লিতে। শেখ মুজিবুর রহমান সেখানে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, সমগ্র মন্ত্রীসভা, নেতৃবৃন্দ, তিন বাহিনীর প্রধানগণ এবং অন্যান্য অতিথি ও সে দেশের জনগণের কাছ থেকে উষ্ণ সংবর্ধনা লাভ করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অকাতরে সব রকম সাহায্য দেওয়ার জন্য তিনি ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এবং জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

১৯৭১ সালের ১০ জানুয়ারি দুপুর ১টা ৪১ মিনিটে জাতির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন। বিমানবন্দর থেকে বঙ্গবন্ধুকে মিছিলসহকারে রেসকোর্স ময়দানে নিয়ে আসা হয়। এ চার মাইল পথ অতিক্রম করতে লাগে আড়াই ঘণ্টা। মৃত্যুর দুয়ার থেকে মুক্ত স্বদেশের বুকে ফিরে এসে প্রিয় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে আনন্দ, আবেগ আর কান্নায় বার বার তার কণ্ঠ ভারী হয়ে আসছিল। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তিনি বলেন, পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী অবস্থায় পৃথিবীর কোনো খবরই আমার কাছে পৌছত না। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল, বাঙালির সংগ্রাম জয়যুক্ত হবেই, আমার দেশ স্বাধীন হবেই। আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার জন্য কবরও খোড়া হয়েছিল। আমি ভাবিনি, আমি ফিরে আসতে পারব। আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে। তবে মনে বিশ্বাস ছিল, আমি মুসলমান, মৃত্যু আমার আল্লাহর হাতে। আল্লাহর রহমত ছিল, আপনাদের দোয়া ছিল, তাই আমি আবার দেশের মাটিতে আপনাদের মাঝে ফিরে আসতে পেরেছি। এ যেন অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা।

➘ স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যাহার কার্যক্রম-পর্যালোচনা করুন।

স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী অস্ত্রশস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও ত্রাণ সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশকে শোষণ থেকে মুক্তির কন্টকাকীর্ণ পথকে সুপ্রশস্ত করে। যুদ্ধপরবর্তী সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর কার্যকলাপ সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের জন্য প্রত্যক্ষ হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। তখন বাংলাদেশিদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। বাংলাদেশের ভূমি থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার।

মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে পাকবাহিনীর পরাজয় যখন প্রায় নিশ্চিত তখন জেনারেল ইয়াহিয়া খান এ যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক রূপ দেয়ার প্রচেষ্টা চালান। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর বিকেলে পাকিস্তানি বিমানবাহিনী ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে বিভিন্ন ঘাঁটির উপর অতর্কিত বিমান হামলা চালালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ থেকে রণাঙ্গনে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী যৌথভাবে পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকে। ভারতের বিমানবাহিনী মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাক-ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ প্রায় ৯৩,০০০ সহযোগী সৈন্য নিয়ে পাক-হানাদার বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্মিলিত মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান সেনাপতি লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

ভারতীয় বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করায় এ দেশের জনগণ প্রথমে তাদের উষ্ণ সম্ভাষণ জানিয়েছিল। কিন্তু অচিরেই তাদের কার্যকলাপ এ দেশবাসীকে বিস্মিত করে। ভারতীয় সেনা সদস্যরা পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া সব রকম অস্ত্রশস্ত্রসহ এ দেশীয় সম্পদ লুণ্ঠন করতে থাকে। সোনা, রূপাসহ বিভিন্ন রকম মূল্যবান আসবাবপত্র, দোকানের মজুদ মালামাল কোনোকিছুই তাদের হাত থেকে রেহাই পায় না। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্ত ছিল সম্পূর্ণ খোলা। এ সুযোগে ভারতীয় সৈন্যরা দেশের বড় বড় মিলকারখানার মূল্যবান যন্ত্রপাতি ট্রাক বোঝাই করে ভারতে পাচার হয়ে যায়। ভারতীয় বাহিনীর উপস্থিতির কারণে বাংলাদেশের মানুষ এর জন্য কোনো প্রকার প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারছিল না।

সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ যখন এভাবে নতুন করে লুণ্ঠিত হচ্ছিল সে সময় পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে এলেন বাঙালির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি অচিরেই উপলব্ধি করতে পারলেন ভারতীয় বাহিনী শুধু এ দেশের সম্পদই লুণ্ঠন করছে না,

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও গন্ত্রপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে। ভারতীয় সৈন্যের উপস্থিতির কারণে সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও অনেক বিদেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তড়িৎ এর সমাধান করতে চাইলেন। তিনি সরাসরি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্বের অধিকারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ইন্দিরা গান্ধীকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, বাংলাদেশের ভূখণ্ডে ভারতীয় বাহিনীর আর কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহার করে নেবার জন্য চাপ দেন। ইন্দিরা গান্ধীও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে এবং বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনী নেতৃত্বের কাছে পরাজিত হয়ে যতশীঘ্রই সম্ভব ভারতীয় বাহিনী প্রত্যাহার করে নিতে রাজি হন। অতঃপর ১৯৭২ সালের ১২ মার্চ বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাতে গিয়ে বলেন, 'বাংলাদেশের জনগণের ভালোবাসা বুকে নিয়ে তারা নিজের দেশে প্রত্যাবর্তন করছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে মিত্রবাহিনীকে (ভারতীয় বাহিনী) স্বদেশে ফেরত পাঠানো বঙ্গবন্ধুর একটি অসাধারণ কৃতিত্ব এবং ইতিহাসের একটি বিরল ঘটনা।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের/রাশিয়ার ভূমিকা

ভৌগোলিক দিক দিয়ে চীনের মত সোভিয়েত ইউনিয়নও দক্ষিণ এশিয়ার নিকটবর্তী একটি পরাশক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হতেই ইউরোপীয় পরিমন্ডল ছাড়িয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বব্যাপী তার প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং একটি নতুন পরাশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। মধ্য ষাটের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেকে একই সঙ্গে ইউরোপীয় ও এশীয় শক্তি হিসেবে দাবী করে। তবে ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় মধ্যস্থতাকারী রাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম দক্ষিণ এশীয় ভূ-খন্ডে বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই কূটনৈতিক প্রয়াসের পেছনে মৌল ভিত্তিই হলো এই যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বাইরের পৃথিবীকে জানাতে চেয়েছিল যে, ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণে দক্ষিণ এশিয়া তার প্রভাব-বলয়ের অন্তর্ভুক্ত এলাকা। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ষাটের দশকে আমেরিকা যতই ভিয়েতনাম সমস্যায় গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন ততই দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাবশালী হয়ে উঠছিল। কিন্তু সত্তর দশকের শুরুতে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন- এ দু'পরাশক্তির মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের তীব্রতা যেমন হ্রাস পেতে থাকে, তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে সম্পর্কেরও চরম অবনতি ঘটে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এমনি প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। সুতরাং চীন, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশাপাশি আমেরিকাও এ যুদ্ধের গতি প্রকৃতি নির্ধারণে ভূমিকা রেখেছিল। তবে পরাশক্তিগুলোর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম বাঙালি গণহত্যাকে নিন্দা জানায়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মনে করা হয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন আগাগোড়াই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা রেখেছিল।

পরাশক্তিগুলোর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম বাঙালি গণহত্যাকে নিন্দা করে। এজন্য মনে করা হয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন আগাগোড়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। সোভিয়েত নীতির পটভূমিতে বিদ্যমান ছিল সোভিয়েত-চীন বিবাদের অভিজ্ঞতা। ১৯৬৯ সালের মার্চে উসুরী নদী বরাবর সোভিয়েতচীন সীমান্ত সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত-চীন বিবাদ চরম পর্যায়ে পৌঁছে। আর তখন থেকেই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনকে প্রতিহত করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে পরিকল্পনা করে তারই অংশ হিসেবে চীন সমর্থিত পাকিস্তানের বিপক্ষ শক্তি ভারতকে সোভিয়েত ইউনিয়ন অধিক নির্ভরশীল মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে। আর ভারতের আকাঙ্ক্ষার দিকে লক্ষ রেখেই সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে অনেকটা শেষপর্যায়ে এসে সমর্থন করে। কিন্তু এ সমর্থন সত্ত্বেও বলা যায় যে, সোভিয়েত নীতি ছিল আগাগোড়াই সুবিধাবাদী এবং অখন্ড পাকিস্তান নীতির সমর্থক। আর এ কারণেই ৬ ও ৭ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন যে দু'টি প্রস্তাব উত্থাপন করে সেখানে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমাধানের কথাই বলা হয়েছিল- যা ছিল চীন ও আমেরিকারও দাবি। কিন্তু তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের মনোভাব বুঝতে পারেনি বলেই হয়তো প্রস্তাব দু'টির বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। আসলে কোন পরাশক্তিই বাঙালির প্রতি মমত্ববোধ কিংবা বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে ভূমিকা পালন করেনি। প্রত্যেকের ভূমিকার পিছনেই ছিল নিজস্ব জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আদর্শিক ব্যাপারটি মুখ্য হলে কৃষক-শ্রমিক তথা সর্বস্তরের বাঙালির মুক্তিসংগ্রামকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থন করত। তবে একথাও সত্য যে, সোভিয়েত নীতি আগাগোড়া সুবিধাবাদী হলেও মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে সোভিয়েত নীতি ছিল পুরোপুরিই বাংলাদেশপন্থী। বিশেষ করে যুদ্ধবিরতি প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদে তিনবার ভেটো প্রয়োগ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বাধাহীন করে তুলতে, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং স্বাধীনতা লাভের পরপরই সোভিয়েত ইউনিয়ন যে ভূমিকা পালন করেছিল তা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল বাংলাদেশের বিবেচনায় খুব হতাশাব্যঞ্জক। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল অখন্ড পাকিস্তান নীতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু মার্কিন কংগ্রেসে বাংলাদেশের সমর্থন ছিল খুবই শক্তিশালী এমনকি মার্কিন প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর ব্যতীত

সরকারের অন্যান্য স্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ছিল ব্যাপক সমর্থন। পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যম এবং জনমনে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ছিল প্রশ্নাতীত। আমেরিকার বাঙালি মহলও সর্বতোভাবে মুক্তিযুদ্ধে নানা ধরনের সহায়তা করে। এমনকি পাকিস্তানের কূটনৈতিক মিশনগুলোতে কর্মরত বাঙালিরা এক পর্যায়ে বাংলাদেশের পক্ষে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সর্বত্র আমেরিকানরা বাঙালিদের বন্ধু অথবা সাহায্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করে জনমত গঠন করে ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এবং শরণার্থী কেন্দ্রে বাঙালিদের নানা ধরনের সাহায্য করে। অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার সহ মার্কিন প্রশাসনের নীতি নির্ধারক মহল ব্যতীত পাকিস্তানের বর্বর হামলা ও অমানবিক কর্মকান্ডের সমর্থন আমেরিকার কোথাও তেমন দেখা যায়নি। মুক্তিযুদ্ধকালীন পুরো নয় মাস নিক্সন প্রশাসন পাকিস্তানের জন্য নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সমর্থন যুগিয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করলেও মার্কিন সংবাদপত্র, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ সহ বেসরকারি পর্যায়ে প্রায় সর্বস্তরের মার্কিন জনগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এমনকি অনেক আমলাও বাঙালির সংগ্রামের প্রতি সহনশীল ছিল। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলোমার্কিন সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান, নিউইয়র্ক ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর, ওয়াশিংটন ইভনিং স্টার, ওয়ালস্ট্রীট জার্নাল ইত্যাদি সংবাদপত্র বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ পরিবেশন করত। 'ওয়াশিংটন পোস্ট' এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে স্বদেশের নাগরিক হত্যার জন্য ইয়াহিয়াকে দায়ী করে। আমেরিকায় কূটনীতিকগণের একযোগে বাংলাদেশের সপক্ষে আনুগত্য পরিবর্তনকে ৯ আগস্ট 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানের সম্পাদকীয়তে একটি নাটকীয় ঘটনা ও প্রতিবাদের বলিষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তবে একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ্য যে, মার্কিন সংবাদপত্রসমূহ প্রধানত মানবতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে একটি সন্তোষজনক রাজনৈতিক সমাধানের সপক্ষে বক্তব্য রেখেছিল, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তারা সবাই মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেনি। তবুও মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে ৫ এপ্রিল, ২ আগস্ট ও ৬ ডিসেম্বর মোট তিনবার নিউইয়র্কের প্রচ্ছদে বাংলাদেশ সংকট স্থান পায়। ২ আগস্ট ও ৬ ডিসেম্বর মোট ২ বার এ সুযোগ হয় টাইমসে। জাতীয় সংবাদপত্র ছাড়াও মফস্বলের সংবাদ মাধ্যমেও বাংলাদেশ সংকট হরহামেশা স্থান পেত। ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং (এনবিসি), ফক্স টেলিভিশন প্রভৃতি মিডিয়াতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে অনেক আলোচনা ও সংবাদ প্রকাশিত হয়। সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, সরকারি নীতি বিপক্ষে থাকলেও মার্কিন সংবাদ মাধ্যম ছিল বাংলাদেশের পরম বন্ধু।

মার্কিন বুদ্ধিজীবীগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে একটি সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। এসোসিয়েশান ফর এশিয়ান স্টাডিজ-এর বার্ষিক সম্মেলনে প্রায় দু'হাজার শিক্ষাবিদ অবিলম্বে গণহত্যা বন্ধের জন্য আবেদন জানান। এই সম্মেলন জরুরি ভিত্তিতে পাকিস্তানে ত্রাণ সামগ্রী পাঠানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাকে অনুরোধ করে। হার্ভার্ড অর্থনীতিবিদ এডওয়ার্ড ম্যাসন, রবার্ট ডর্ফম্যান ও স্টিফেন মার্গোনিল প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, ইয়াহিয়া সামরিক চক্রের দমন নীতি সত্ত্বেও বাংলাদেশের অভ্যুদয় অবধারিত। এছাড়াও ত্রিশজনের মতো বুদ্ধিজীবী দলবদ্ধভাবে ঘোষণা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায়সঙ্গত দাবিকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উপেক্ষা করার কোন অধিকার পাকিস্তানের নেই।

মার্কিন প্রশাসনের অন্দরমহলের কিছু আমলা বিশেষ করে পররাষ্ট্র দপ্তরের কিছু আমলা এবং ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের কর্মচারীগণ মার্কিন প্রশাসনের নিরপেক্ষতা বা পাকিস্তান ঘেষা নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। ঢাকার কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড ১৯ জন কূটনীতিবিদের স্বাক্ষরসহ ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দপ্তরকে এক কড়া পত্রে জানান যে, মার্কিন নীতি শুধু নৈতিকভাবেই অগ্রহণযোগ্য নয়, বরং মার্কিন স্বার্থেরও পরিপন্থী। এছাড়াও স্টেট ডিপাটমেন্ট, ইউ.এস.এ. আই.ডি. এবং কৃষি ডিপার্টমেন্টের অনেক কর্মকর্তা সরকারি নীতির সমালোচনা করেন।

পরিশেষে বলতে পারি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল অখন্ড পাকিস্তান নীতিতে বিশ্বাসী। স্বাভাবিক ভাবেই মার্কিন প্রশাসন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেনি। বরং পাকিস্তানকে নৈতিক অর্থনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে সর্বদা সহযোগিতা করেছে। বাংলাদেশ বিরোধী মার্কিন নীতি ছিল একান্তভাবেই হোয়াইট হাউসের, বলা যায়, স্রেফ নিক্সন-কিসিঞ্জারের ব্যক্তিগত নীতি। কেবলই পাকিস্তান প্রীতি ছাড়া তাদের এ নীতির কোন ভিত্তি ছিল না। চীন-মার্কিন সম্পর্ক স্থাপনে পাকিস্তান দূতিয়ালীর ভূমিকা পালন করা, সিয়াটো-সেন্টোর সদস্য হওয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের পুরানো বন্ধু হওয়ার সুবাদে পাকিস্তান আমেরিকার সহানুভূতি পেয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। মার্কিন প্রশাসন পাকিস্তানের প্রতি এতটাই ঝুঁকে পড়েছিল যে, পারমানবিক যুদ্ধ জাহাজ সম্বলিত 'সপ্তম নৌবহর' ও 'এন্টারপ্রাইজ'কে বঙ্গোপসাগরে পাঠিয়েছিল। কিন্তু সরকার পাকিস্তানপন্থী হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন কংগ্রেস, মার্কিন সিনেট, প্রচার মাধ্যম, সর্বস্তরের জনগণ ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অকৃত্রিম সমর্থক। এদের চাপেই আমেরিকা পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য বন্ধ করতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও গোপনে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত ছিল। মার্কিন কংগ্রেসের উভয় কক্ষে বাংলাদেশ সংকট নিয়ে ২১০টি বিবৃতি দেয়া হয়েছিল- এ থেকে বুঝা যায় যে, মার্কিন কংগ্রেস বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে একটি শক্তিশালী সমর্থকে পরিনত হয়েছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এবং ৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য নিউজার্সির কংগ্রেসম্যান হেনরি হেল স্টোক্সি কর্তৃক সিনেটে প্রস্তাব পেশ ও সর্বসম্মতভাবে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তা পাশ হওয়া সত্ত্বেও নিক্সন প্রশাসন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছিল ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীনের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের যেসব শক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল চীন তাদের অন্যতম। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে চীনের সরকারি অবস্থান ছিল পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতমূলক। বাংলাদেশের সংকট নিয়ে চীনের প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয় ১১ এপ্রিল ১৯৭১ সালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি চৌ এন লাই-এর চিঠির মাধ্যমে। ঐ চিঠিতে চৌ এন লাই পাকিস্তানের ঘটনাবলীকে সে দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে

জানান এবং জনগণ বিদেশী হস্তক্ষেপ ছাড়াই তা সমাধান করবে বলে উল্লেখ করেন। এমনকি পাকিস্তানের 'জাতীয় স্বাধীনতা' ও 'রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব' রক্ষায় চীনের দ্ব্যর্থহীন সমর্থনের কথাও তিনি জানিয়েছিলেন। অবশ্য চিঠিতে তিনি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কোন বক্তব্য রাখেন নি। তবে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে চীন বাঙালির সংগ্রাম ও নির্যাতনের প্রতিও কোন সহানুভূতি দেখায় নি। বরং পাক সামরিক চক্রের প্রতি জানিয়েছিল অকুণ্ঠ সমর্থন। এমনকি চীনপন্থী রাজনীতিবিদ হিসাবে পরিচিত মাওলানা ভাসানীর আকুল আবেদন সত্ত্বেও চীনা নীতিতে কোন পরিবর্তন আসেনি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন নয় মাসে চীনের নীতি ও কার্যক্রমকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় যথা-

ক. মুক্তিযুদ্ধের শুরু হতে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত

১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরুর পূর্ব পর্যন্ত চীন পাকিস্তানপন্থী থাকলেও মোটামুটিভাবে বাঙালির সংগ্রাম বিরোধী কোন মন্তব্য করেনি। এমনকি এপ্রিল হতে অক্টোবর পর্যন্ত চীন প্রকাশ্যে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেনি। তবে গোপনে সে পাকিস্তানের সামরিক চক্রকে নৈতিক শক্তি ও সাহস যুগিয়েছিল এবং সরাসরি সামরিক উপকরণ সরবরাহ করেছিল। ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট ভারত-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরের পর চীনের পাকিস্তানপন্থী নীতি আরও প্রকট হয়ে ওঠে। সেপ্টেম্বর মাসে চীন পাকিস্তানকে এই বলে আশ্বস্ত করে যে, জাতীয় স্বার্থরক্ষায় চীন পাকিস্তানকে সাহায্য করবে। তখন পর্যন্তও চীনের বক্তব্যে বাঙালি বিরোধী তেমন বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। এজন্য প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার অনেক সময় আশা করতেন যে শেষপর্যন্ত হয়তো চীন সংগ্রামী বাঙালির পক্ষে দাঁড়াবে। কিন্তু সে আশা সফল হয়নি। যাহোক, ৫ নভেম্বর চীনাদের আস্থাভাজন ভুট্টোর নেতৃত্বে একটি পাক প্রতিনিধিদল চীন সফরে যায়। চীন থেকে অতিরিক্ত অঙ্গীকার বা সাহায্য পাওয়ার আশায়। কিন্তু চীনের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী চি পেঙ ফী পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার একটি ন্যায়সঙ্গত সমাধান খুঁজে বের করার জন্য আহবান জানিয়েছিলেন। বাঙালি বিরোধী বক্তব্য না রাখলেও পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্ত দিয়ে চীন নিয়মিতভাবে পাকিস্তানকে সমরাস্ত্র পাঠাতো। এছাড়াও গেরিলা যুদ্ধে প্রশিক্ষণ দানের জন্য চীন অক্টোবর মাসে ঢাকায় ২০০ (দু'শ জন) সামরিক বিশেষজ্ঞ পাঠিয়েছিল। উল্লেখ্য, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর হতে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান মোট ২০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের চীনা সামরিক উপরকণ সাহায্য হিসাবে পেয়েছে- যার মধ্যে ১৯৭১ সালেই সরবরাহ করেছিল ৪৫ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র। আর চীনের রাইফেল ও অন্যান্য উন্নত সমরাস্ত্র দিয়েই পাকবাহিনী নির্বিচারে হত্যা করেছে বাঙালিকে।

খ. ৩ ডিসেম্বর হতে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের পূর্বাঞ্চলে সামরিক হামলা করলে শুরু হয় সরাসরি পাক-ভারত যুদ্ধ। এ সময় হতে চীন জাতিসংঘে সরাসরি বাঙালি বিরোধী ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। পাক–ভারত যুদ্ধের জন্য চীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে দায়ী করে। যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করা এবং পাকবাহিনীর বর্বরতার ফলে সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ করার লক্ষে ৫ ও ৭ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘে দু'টি প্রস্তাব উপস্থাপন করে। কিন্তু প্রস্তাব দুটোর বিরুদ্ধে চীন প্রথম ভেটো প্রয়োগ করে এবং চীনের নিজস্ব প্রস্তাবে ভারতকে আগ্রাসী পক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, চীন জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের মাত্র ৪০ দিনের মাথায় নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী আসন লাভের পর প্রথম প্রস্তাবেই ভেটো প্রয়োগ করেছিল। যাহোক, ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে চীন এক বিবৃতিতে 'তথাকথিত' বাংলাদেশের সৃষ্টির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের তীব্র সমালোচনা করে। স্বাধীন বাংলাদেশকে 'তথাকথিত বাংলাদেশ' বলে অভিহিত করা বাঙালির স্বাধীন অস্তিত্বের প্রতি ছিল চরম ঘৃণা ও অবহেলার শামিল। এমনকি বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত চীন বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই স্বীকৃতি দেয়নি।

সারাংশ হলো- মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে চীনের যে ভূমিকা ছিল তা আপাতদৃষ্টিতে পাকিস্তান ঘেষা হলেও মূলত তা ছিল চীনের জাতীয় নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক অখন্ডতা নিশ্চিত করার নীতি। দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের বিরুদ্ধে রুশভারত আঁতাতের ফলে চীন বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই সে প্রতিবেশী অপর রাষ্ট্র পাকিস্তান এবং অন্যতম পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীনের বিরোধিতার জন্য বাংলাদেশের চীনপন্থী দলগুলোর ভূমিকাকেও ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। কারণ চীনপন্থী দলগুলো আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনকে বুর্জোয়া পথ বলে তা গ্রহণ করেনি এবং আওয়ামী লীগ কর্তৃক গৃহীত যে কোন পদক্ষেপের মধ্যে ভারতের গন্ধ খুঁজতে ব্যস্ত থাকতো। সুতরাং এদেশের বামদের কর্মকান্ডও চীনা নীতিতে প্রভাব ফেলেছিল। তবে সরকারিভাবে চীনা নীতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে হলেও চীনের অধিকাংশ জনগণের সমর্থন ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি। তাই ১৯৭১ সালের ৭ নভেম্বর ভুট্টোর চীন সফরকালে পিকিং-এ একদল চীনা যুবক ভুট্টো ও পাকিস্তান বিরোধী স্লোগান দিয়ে জানতে চায় যে, পাকিস্তান সরকার কেন পূর্ব পাকিস্তানিদের ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, চীন জাতিসংঘে ভেটো ক্ষমতার অধিকারী হয়ে প্রথমবারই ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। এমনকি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও চীন বাংলাদেশকে 'তথাকথিত' বাংলাদেশ বলে আখ্যায়িত করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বহির্বিশ্বের যেসব শক্তি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে বিশেষভাবে জড়িত ছিল ভারত তার মধ্যে অন্যতম। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বহির্বিশ্বে যে প্রতিক্রিয়া হয় সে প্রতিক্রিয়ায় ভারতই প্রথম দেশ- যেখানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অত্যন্ত পজেটিভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে ভারত এত ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিল যে ভারতের অবদানের

কথা উল্লেখ না করলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশ বা ভারতে এ বিষয় কোন প্রামান্য গ্রন্থ রচিত হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর অনেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখেছেন- যেখানে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার বিবরণ আছে, মুক্তিবাহিনীর সাহসিকতাপূর্ণ প্রতিরোধ যুদ্ধের বর্ণনা আছে, পাকিস্তানি বাহিনী ও দেশীয় দালালদের কার্যকলাপের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু এ দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের কথা তেমন উল্লেখ নেই। বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও ভারতের সামরিক সাহায্যের কথা বলা হয়েছে, কোথাও রাজনৈতিক সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু ভারতের সাহায্যের সামগ্রিক দিক কখনও আলোচিত হয়নি।

১৯৯৫ সালে সারা ইউরোপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করেছে। মিত্রবাহিনীর যোদ্ধাদের সারা পৃথিবী থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। তাদের সংবর্ধিত করা হয়েছে সাড়ম্বরে, টেলিভিশনে তাদের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি পঞ্চাশ বছর পরও মিত্রবাহিনীর বীরযোদ্ধা এবং নিহতদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে নাৎসি ও ফ্যাসিস্ট বাহিনী কবলিত পূর্ব-পশ্চিম ইউরোপ ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলো। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি নিয়েছিল।সরকারিভাবে সামরিক মহড়া, কুচকাওয়াজ, জেলখানা, হাসপাতাল ও এতিমখানায় উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের কর্মসূচিও নেয়া হয়েছিল। কিন্তু সরকারি বা বেসরকারি কোনও উদ্যোগের ভেতর মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান স্মরণ করার কোনও কর্মসূচি স্থান পায়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় সামরিক বাহিনীর যেসব সদস্য শহীদ হয়েছেন তাদের অবদানও সরকারিভাবে স্বীকার করা হয়নি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা ছিল প্রত্যক্ষ, গভীর ও ঘনিষ্ঠ। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যাপারে বাংলাদেশের নিজস্ব প্রচেষ্টার পাশাপাশি ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রচার মাধ্যম ও কূটনৈতিক মাধ্যমে ভারত বিশ্ব বিবেকের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিল যে, অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের অজুহাতে বাংলাদেশে যে গণহত্যা চলছে তা প্রতিহত করা বাইরের শক্তির নৈতিক দায়িত্ব। ভারত মানবিক প্রেক্ষাপট হতেই বিষয়টি বিচার করছিল বলে জানিয়েছিল। কিন্তু ভারতের ওপর শরণার্থী সমস্যা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত এ সমস্যার আর কোন সমাধান ভারতের হাতে ছিল না। সুতরাং গণহত্যার বিরুদ্ধে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি শরণার্থী সমস্যা ও অন্যান্য আরও কিছু কারণে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সামরিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন প্রদান করে। এমনকি ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখ হতে বাংলাদেশের নিয়মিত বাহিনীর সাথে মিলিতভাবে যৌথ বাহিনী গঠন করে এবং সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। এ যুদ্ধে ভারতের নিয়মিত বাহিনীর প্রায় ৪ হাজার সৈন্য এবং আরও অনেক বেসরকারি লোকের প্রাণহানি ঘটে। প্রচুর অর্থ ও গোলাবারুদ ব্যয় হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা সহ সীমান্তবর্তী এলাকায় আর্থ-সামাজিক ও আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার ওপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ত্যাগ স্বীকার ছিল অতুলনীয়।